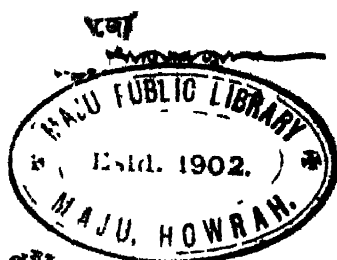
তত্ত্বোপনিষদ্ ।

প্রথম ভাগ ।

কমলাকান্ত ব্রহ্মদাস প্রণীত ।



কলিকাতা,

১ শঙ্করঘোষের লেন, নব্যভারত-বসুমতী প্রেসে

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত

ও

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত ।

১৩০২ সন ।

মূল্য ৷৹ আট আনা ।

নিবেদন।

"তত্ত্বোপনিষদ্" প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ ভাষার উন্নতি হইতেছে, তাহাতে ইহার স্থান পাইবার কথাই নয়। তথাপি দীনের গতি অনিবার্য্য, ইহা সাধ্যাতীত বিষয়েও প্রবৃত্তি দেয়। ভরসা করি, সাধু-সাধকগণ ভ্রমাচ্ছন্ন ভাষা ভাবাদির কোনও স্থানে, যদি কণ্টকাবৃত কেতকী-পুষ্পগন্ধ সদৃশ একটুকু সত্যের গন্ধ পান, দয়া করিয়া তাহাই গ্রহণ করিবেন।

দেখিতেছি, এই ধর্ম্মবিপ্লব সময়ে সকল প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যে অনেকেই সাধ্যায়ত্ত শক্তিসহকারে নিজ নিজ বিশ্বাসের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া, ধর্ম্মের সারতত্ত্ব অন্বেষণ করিতেছেন। বস্তুতঃই পৃথিবী সময়ে সময়ে অসত্য অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইলে, স্বভাবতঃ সত্যের উজ্জলজ্যোতি প্রকাশ হয়, এই আন্দোলনের ভিতর দিয়া নিশ্চয়ই সত্যের আলোক প্রকাশিত হইবে। মানব-প্রকৃতি মতবৈষম্যের অধীন হইয়া, এক একটী মতের তরঙ্গে ভাসিতে থাকিলেও, নিরাশার কথা নাই। যখন মাদৃশ ক্ষুদ্র-বুদ্ধি, অধম ব্যক্তির কঠিন হৃদয়েও, কখন কখন এক এক বিন্দু প্রভুপ্রদত্ত প্রেমবৃষ্টি পড়িতেছে, তখন ইহা বড়ই প্রীতি ও আশার কথা। নতুবা এরূপ অভাজন দ্বারা একখানি ক্ষুদ্রগ্রন্থ জনসমাজে প্রকাশিত হইবে কেন? ইহাতে ভাষা ও ভাবের বিশুদ্ধতা ও লালিত্যাদি কিছুই নাই। ইহা একমাত্র সাধু-সজ্জন-গণের দয়ার ভিক্ষার্থী—তত্ত্বদর্শিগণ ইহাই মনে ভাবিয়া দোষরাশি পরিত্যাগ করতঃ যদি অবকাশ মত আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, তাহা হইলে ধন্য ও কৃতার্থ হইব।

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

তত্ত্বোপনিষদ্।

অভ্রান্ত গুরু কে?

পৃথিবী প্রকৃত তত্ত্ব গ্রহণ করিতে উদাসীন্ কেন? ইহার মূল অন্বেষণ করিলে ইহাই দেখা যায়, মানব-প্রকৃতি স্বভাবতঃই কল্পনা-প্রসূত অলৌকিক ঘটনার অধীন, জড় বিজ্ঞানের শক্তি-কেই মহাশক্তির ব্যাপার সিদ্ধান্ত করিয়া পরিতৃপ্ত হয়; সুতরাং সত্যানুসন্ধানে পরাঙ্মুখ হইবে, আশ্চর্য্য কি? সাধু ও সাধকগণ যতই কেন উচ্চতম প্রদেশে অবস্থিতি করুন্ না, যদি জাত্যভি-মান, স্বার্থ ও সম্মানকে পরিত্যাগ করিতে না পারেন, তবে অবশ্যই বলিতে পারি, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান প্রচ্ছন্ন রাখিয়া অনুদার ভেদভাবকে প্রশ্রয় দেন। সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন এবং বিবিধ পুরাণে গুরুভাব দ্বারা মানব শক্তি ঐশী শক্তিরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতেই জানা যাইতেছে যে, ইহারা বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান, স্বাভাবিক জীবন-বেদ, মধুর ভ্রাতৃত্ব তত্ত্বকে বিনাশ করিয়াছে। সংসার পরপিণ্ড-প্রত্যাশী হইয়া স্বয়ং শক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

এস্থলে স্পষ্টই বলিতে পারি, গুরুবাদই ভেদের বীজপুরুষ। ইহা হইতেই জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, মতভেদাদির সৃষ্টি হইয়াছে। কেন না, গুরু শিষ্যের শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট ভাবের আতিশয্য বশতঃ

স্বার্থপরতা দ্বেষ হিংসাদির আক্রমণে উদার সরল তত্ত্ব পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছে। জটা, তুলসী, রুদ্রাক্ষধারী মানব গুরু, ব্যাঘ্র চর্ম্মের আসনে বসিয়া, শূদ্র শিষ্যের হস্তে এক বিন্দু জল কিরূপে গ্রহণ করিবেন ? একাসনেই বা কিরূপে বসিবেন ? ভেদের কারণ দেখাইতে বাধ্য হইয়া, এই কথাটি বলিতে হইল। যাহা হউক, এক্ষণে যে বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

আহা ! এক বিন্দু শুক্র-শোণিত হইতে অস্থিমেদময় দেহ-রূপে ভূমিষ্ঠ হইলে মাতৃস্তন্য ধরিয়া দুগ্ধপান করিবার জ্ঞান পাইয়াছি, উঠিতে, চলিতে, বসিতে শিখিয়াছি, ওঁমা শব্দে প্রথমেই আপনা হইতে কথা বলিয়াছি ইত্যাদি। ইহার উপদেষ্টা কে ? কাহার শক্তি হইতে শিশুর ভিতরে যুবা, যুবার ভিতরে বৃদ্ধ, বৃদ্ধের ভিতরে স্থবীর এবং ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়া বৃহৎ হয় ? ইহা কি কোন মানুষে গড়িয়া দেয় ? যদি বলেন, না ; তবে ইহার কর্ত্তা কে ? এক মাত্র ব্রহ্ম জীবের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। আমার প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসে থাকিয়া আমাকে রক্ষা করিতেছেন। শরীরস্থ যন্ত্র সকলের কার্য্য সুশৃঙ্খলা মত চালাইয়া দিতেছেন। রক্তস্থলি হইতে প্রত্যেক শিরায় শিরায় রক্ত সঞ্চালন দ্বারা জীবিত রাখিয়াছেন। দর্শন, শ্রবণ, ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতির জ্ঞান এবং দুর্গন্ধ সুগন্ধ অনুভব শক্তি স্বাভাবিক ভাবেই পাইয়াছি। সেই জীবন্ত গুরু জীবনের সমস্ত কার্য্য করিতে পারেন, ঐ পরিত্রাণের পথটাই কেবল দেখাইতে পারেন না ? তিনি কি এখন বার্দ্ধক্যের যাতনায় অক্ষম যে, এক একটি মানুষের প্রতি উদ্ধারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন।

অপূর্ণ মানবশক্তির প্রতি নির্ভর করিলে জীবের মুক্তি হয়, ইহা কি ভ্রান্তির কথা নহে? মানব ব্রহ্মে ডুবিলেও তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। পবন যেমন সমুদ্রের তরঙ্গে মগ্ন হইয়াও ক্ষুদ্রাবস্থাতেই অবস্থিতি করে, সেইরূপ মানবশক্তিও মহাশক্তির নিকট বিন্দুতুল্য সীমাবদ্ধ, কাজেই, অন্যকে পরিত্রাণের পথ দেখাইতে পারে না। হয়ত অনেকে আপত্তি করিতে পারেন, বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি সাধুভক্ত এবং জাহাজের খালাসী মুটে মজুর সকলেই ত মনুষ্য। তবে এই উভয়বিধ ভাবে মানবশক্তি বিভিন্ন দেখিতে পাই কেন? ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় ঈশ্বর জগতের পরিত্রাণের জন্য ব্যক্তি বিশেষে ঐশী শক্তি প্রদান করেন। এই কথা স্বীকার করিলে ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব দোষ ঘটে। কেন না, তিনি দয়াময়; পাপীই হউক বা সাধুই হউক, সমভাবে মানবকে যথোপযুক্ত সকল শক্তি দিয়াছেন। মনুষ্য স্বাধীন শক্তি প্রভাবে উন্নতি অবনতির অবস্থায় অবস্থিতি করে। যেমন দুইটি লণ্ঠনের মধ্যে যেটি স্বচ্ছ বা পরিষ্কৃত, তাহার ভিতর দিয়া আলো উজ্জ্বল রূপে ফুটিয়া উঠে; অপরটি ধূলাদি আবর্জ্জনায় প্রচ্ছন্ন, উহার ভিতরে আলো সমান জ্বলিতেছে, কিন্তু তাহার জ্যোতিঃ আদবেই দেখা যায় না। দোষ কি আলোকের, না পাত্রের? সেইরূপ, নিশ্চেষ্ট মানব পরপিণ্ড-পোষিত হয়, স্বয়ং শক্তি প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না; সুতরাং দুরবস্থায় অবস্থিতি করে, আর অপূর্ণ মানব শক্তি ধরিয়া কৃতার্থ হইতে থাকে। এস্থলে বিজ্ঞানেরও একটি আপত্তি আছে। আপত্তিটি এই, পিতামাতার শরীরের এবং মনোবৃত্তির অবস্থাভেদে সাধু অসাধু, জ্ঞানী মূর্খ ইত্যাদি ভাব

সন্তানেও সংঘটিত হয়। কিন্তু মনুষ্যের তাহাতেও নিজের শক্তি প্রয়োজন হয়। প্রাণগত অধ্যবসায় এবং সাধন দ্বারা অসাধু সাধু, মূর্খ তর্কচূড়ামণি হইতে পারে। বর্ষা-তরঙ্গিণীর কলুষিত জল কি নির্ম্মল হয় না ?

বাস্তবিক ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মূর্খ, সকল প্রকার মানবাত্মার ভিতরেই জ্যোতিঃ স্বরূপ গুরু স্থিতি করিতেছেন। অনন্ত মহাশূন্যে পিতা পুত্র ভিন্ন আর কিছুই নাই। কীটাদি পর্য্যন্ত সকলেই ভ্রাতৃ সম্বন্ধে আবদ্ধ। মানব কোন্ প্রাণে গুরু বা আচার্য্য হইতে ইচ্ছা করেন, সমাসনে বসিতে ক্লেশ বোধ করিয়া গুরু-সম্মানিত স্বতন্ত্র আসন গ্রহণে সুখী হন ? ইহাতে যে উদার প্রেম কলঙ্কিত হয়, দেখিতে পান না। এই ভেদ-জনিত পাপের প্রভাবেই ত প্রকৃত সত্য প্রকাশ পাইতেছে না। বিন্দুমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান বোধ থাকিতে উদার প্রেমে জগৎকে কেহ আলিঙ্গন করিতে পারিবেন না। শ্বপচাদির অন্ন গ্রহণ করিলেই যে উদার প্রেম স্থাপিত হইল, তাহা নহে। অপ্রভেদ জীবভক্তি, সর্ব্বগত অবিচ্ছিন্ন প্রেম ও অকৃত্রিম দীনতার সাধন না হইলে ব্রহ্ম দর্শন হইবে না।

হে মানব ভাই ! তুমি গুরু হইয়া কিরূপে ব্রহ্মকে দর্শন করিবে ? অধ্যাত্মযোগে, ইন্দ্রজালের ন্যায় কল্পিত কৃষ্ণ চৈতন্যের মূর্ত্তি দেখিয়া এবং আত্মার পরিমিত শক্তি সঞ্চালন করিয়া কি হইবে ? উহা যে ব্রহ্মের পরীক্ষা। সাধক বাহ্যিক খণ্ড মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলে অনন্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবিতে পারে না, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। মানব গুরুর বিজ্ঞান-তত্ত্ব ধরিয়া কোথায় যাইব ? পরিমিত জলবিম্ব কোটি গুণ

হইলেও ক্ষুদ্র; পরস্পরের শক্তি একত্র হইলেও অপূর্ণ। তবে বলিতে পারেন, মানব হৃদয় হইতে যে সকল ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ হয়, তাহা কি ঈশ্বরের উপদেশ নয়? এ কথা অবশ্যই স্বীকার করি। ব্রহ্ম অসংখ্য জগৎ এবং জীব শক্তিকে ভেদ করিয়া নিত্য ভাবেই রহিয়াছেন। পশু, পক্ষী, মানব সকলেই উপদেশ দিতেছে। একটি পত্রের নিকটেও শিক্ষা পাইতেছি। চৈতন্য ব্যাধকেও গুরু বলিয়াছেন।

ধীর গম্ভীরভাবে দেখিলে সকলেই ত গুরু। যখন অখণ্ড চৈতন্যময় ব্রহ্ম সমস্ত প্রাণীতে বর্ত্তমান আছেন, তখন ঐ বিদ্যারত্ন মহাশয় গুরু, আর বসুজা বা সাজী মহাশয় গুরু হইতে পারেন না, ইহা নিতান্ত ভ্রমের কথা। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মানুষ নিজেই আপনার শক্তিকে দুর্ব্বল করে। তাই বলিয়া কি মানব খণ্ড ভাবে গুরু হইতে পারে? মানবাধারে ব্রহ্ম শক্তির প্রকাশ দেখিয়া কি মধুর ভ্রাতৃত্ব তত্ত্ব হারাইব? ভ্রাতৃভাবে উপদেশ গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? পৃথিবী বুঝিতেছে না যে, অবতারবাদ, প্রেরিতবাদ, গুরুবাদ, এই সকল প্রভেদ ভাবের সংস্পর্শে নিষ্কলঙ্ক উদার প্রেম কলঙ্কিত হইতেছে। মানব সকল ভেদক্রব্যাদির করাল গ্রাসে ভীষণ যন্ত্রণায় অভিভূত। জ্ঞানে ভেদ, প্রেমে ভেদ, ভক্তিতে ভেদ, যোগসাধনে ভেদ, আহার বিহার সমস্ত কার্য্যে ভেদ, নির্ব্বিকান্তঃকরণে বলিতে পারি, উদার ব্রাহ্মসমাজের ভিতরেও এই রোগ দেখা দিয়াছে। কেহ বা সাধু ভক্তির তরঙ্গে ভাসিতেছেন, কেহ বা গুরু ভক্তির আবর্ত্তে ঘুরিতেছেন। ভাবেন না যে, অপ্রভেদ জীব ভক্তির অভাবে ব্যক্তিগত সাধু ও গুরুভক্তি উভয়ই ভুজঙ্গ স্বরূপ; সময় পাইলে দংশন করিবে।

এখন দেখা যাক্, এই ঘোরতর যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণের উপায় কি। দেখিতেছি, এক মাত্র ভ্রাতৃভাব ব্যতীত কোন প্রকার পার্থক্যভাবে প্রেমের মিলন হইবে না। গুরু শিষ্য, সাধু অসাধু, রাজা প্রজা, এক প্রেমের শৃঙ্খলে বদ্ধ না হইলে উপায় নাই। এ কথা শুনিবা মাত্র অনেকেই চটিয়া বলিবেন, কি! ব্যক্তি বিশেষে গুরু বা সাধু ভক্তি উড়িয়া যাইবে? কলিকাতার ব্যারিষ্টার আর মফঃস্বলের ফড়ে মোক্তার সমান হইল? ভাই! চটিবেন না, ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখুন, পিতার পিতৃত্ব স্বত্বে সকলেরই পুত্রভাবে সমান অধিকার আছে। সাধুকে সাধু-ভ্রাতা বলিতে দোষ কি? অসাধুকে ভাই বলিয়া কি ভক্তি করিতে হইবে না? তাহা হইলে ত ব্রাহ্মধর্ম্ম টিকে না। আমার মত পাপীকে ভ্রাতৃ সম্বোধনে মুখ চুম্বন করিলে প্রেম কি থাকিবে না? আহা! ব্রহ্ম-স্বরূপে সংসারের পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি সকলই ত পুত্রভাবে রহিয়াছেন। সুতরাং নিত্য সম্বন্ধে ভ্রাতৃত্ব রূপ মধুর তত্ত্বের মিলন ভিন্ন আর কি আছে? নিরাকারে পিতা পুত্রের লীলা নিত্যকাল একই ভাবে হইতেছে।* এই জন্যই, কেহ পরস্পর ভ্রাতৃভাবের মিলনে আপত্তি করিতে পারেন না। দুঃখের কথা বলিতে হইলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হয়। আবার সাধক শ্রেণীর মধ্যেও ভ্রাতৃভাবের বিচ্ছিন্ন দেখিতেছি। উপাসনার সময় ভাবের উচ্ছ্বাসে এবং প্রেম ভক্তির তরঙ্গে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল; পরক্ষণে সংসারের বাতাসে শিশির কর্পূর কোথায় উড়িয়া যায়,

---

* খ্রীষ্ট এই স্বর্গীয় গূঢ়তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই ভ্রাতৃভক্তিতে সঙ্গীগণের চরণ ধৌত করিতেন।

গন্ধও থাকে না। কোন সাধক একটি ভ্রাতার একটুকু অসুস্থ অবস্থা দেখিয়াই সরিয়া পড়েন। ভাইটির এক দিনের জন্য থাকিবার স্থানও এক মুষ্টি অন্নও দুর্ল্লভ। এইরূপ অনেক উপাসকের প্রাণের অবস্থা দেখিলে, মিলনের আশা অতি অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক, প্রকৃত দীনতার অভাবে, মতের অনৈক্য প্রযুক্ত, তর্ক বিতর্ক ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। গুরুবাদ পৃথিবীকে আক্রমণ করিবে সন্দেহ কি?

অনেকে বাহিরের ভাবে বদ্ধ থাকিয়া প্রকৃত সত্যকে ঢাকিতেছেন। হায়! জীবনের মহাগুরু, যিনি প্রতিমুহূর্ত্ত উপদেশ দিতেছেন—তাঁহার অব্যর্থ আদেশ উপেক্ষা করিয়া মানুষ অপূর্ণ মানবের উপদেশেই পরিতৃপ্ত। বিবেকের মঙ্গল সম্বাদ বুঝিতে না পারিয়া, অসার ক্রিয়া পদ্ধতির অনুষ্ঠানে সতত ব্যাপৃত। প্রাণায়াম দ্বারা আত্মাকে সীমাবদ্ধ বায়ুকোষে রাখিলে কি ব্রহ্ম কৃপার প্রতি অবিশ্বাস করা হয় না? যদি প্রক্রিয়ার বশীভূত হইয়া "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্," এই মহাতত্ত্বকে বিশ্বাস না করি, নিশ্চয়ই আমি প্রভুর নিকট অবিশ্বাসী। স্বাভাবিক ব্রহ্ম কৃপার প্রতি নির্ভর করিলে যে সহজেই জীবন্মুক্তি হয়, ইহার অন্যথা কে করিবে? আত্মা যতই ব্রহ্মে মজিবে, ততই শ্বাস প্রশ্বাস কমিয়া যাইবে। পরিমিত বায়ু কোষ-বদ্ধ জীবের যন্ত্রণা হইতে কি ইহা সহজ নহে? আত্মা মহাকাশ অতিক্রম করিয়া চিন্ময় ব্রহ্মসাগরে বিরাজ করে, একথা কি মিথ্যা? তবে বলুন, গুরু কে? এক মাত্র অখণ্ড পুরুষ ভিন্ন আর কাহাকে গুরু স্বীকার করিবেন? মানবশক্তি কিছুতেই ব্রহ্ম শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারে না। যেমন নদী সকল পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে

মিলিত হয়, কিন্তু সমুদ্রকে কখনই পর্ব্বতে আনিতে পারে না, সেইরূপ, মানবাত্মা ব্রহ্মে ডুবিয়াও অন্তকে ব্রহ্মদর্শন করাইতে সক্ষম হয় না।

ব্রহ্ম কৃপাই পরিত্রাণের একমাত্র সহায়। জগতের সমস্ত মানব একত্র হইয়া শিক্ষা বা উপদেশ দিলেও তাহা বিফল। এস্থলে অবশ্যই কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে সাধু বা সৎসঙ্গের প্রয়োজন কি ? মনে করুন, একটী চতুষ্কোণ কাচ পাত্রের অভ্যন্তরে একটী দীপ জ্বলিতেছে। কিন্তু দর্শকগণ উহার চারিদিকে চারিটি ঐরূপ আলো দেখিতেছেন, সত্য কথা। ফলতঃ ঐ পাত্রের গায় হাত দিলে ধরা যায় না কেন ? আবার ক্ষিপ্র হস্তে প্রকৃত দীপ কলিকাকে স্পর্শ করিলে চারিটিকেই স্পর্শ করা যায়। তবে প্রকৃত গুরুকে ছাড়িয়া অপ্রকৃত মানবকে অভ্রান্ত গুরু বলিবার প্রয়োজন কি ? উচ্চ নীচ সকলের নিকট ভ্রাতৃভাবে সৎসঙ্গ করিতে কোন বাধা নাই। ভ্রাতৃসহবাসে ঈশ্বরের তত্ত্ব গ্রহণ করিলেই যে গুরু ভক্তি প্রকাশ পাইল, তাহা নহে। মানবশক্তি যতই উজ্জ্বল হউক না কেন, ইহা মহাশক্তি অনন্ত জ্যোতির নিকট পরাভূত। এই জন্য বলিতেছি, মনুষ্য গুরু শব্দের বাচাই হইতে পারে না। ব্রহ্মই অভ্রান্ত গুরু। প্রাণী মাত্রই তাঁহার শিষ্য।

সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব।

শাস্ত্র-বিশারদগণের যুক্তি প্রমাণে সাকার ও নিরাকার তত্ত্বের বিভিন্ন শক্তি বুঝা যায় না। সাকার ব্রহ্মের উপাসনার যে মীমাংসা, তাহা কি বিশদ রূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না? এই যে তরুলতা সমাকীর্ণ নানাবর্ণ রঞ্জিত জগচ্চিত্র—ইহার ভিতরে কে? সমস্ত এক শক্তিরই ত ব্যাপার, তবে আর ঐ দুটি তত্ত্ব লইয়া এত মতভেদ হয় কেন? বাস্তবিকই এই গূঢ় তত্ত্বের অনুসন্ধান করা অতীব দুরূহ, কেননা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব চিন্তা মানব বুদ্ধির অতীত। নিরাকার অসীম শক্তির তত্ত্বানুসন্ধান করিতে গিয়া অনেকেই নিরীশ্বরবাদী হইয়া পড়েন, এদিকে স্থূল তত্ত্ব বুঝিতে যাইয়াও জড়বাদী হইতে হয়, দেখিতে পাই, উভয় দিকেই বিড়ম্বনা। এই জন্য পৃথিবীতে ধর্ম্মভাবের অসামঞ্জস্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান না হইয়া বরং ভাবগত যুক্তি-তর্কের কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, বিষয়টি কঠিন হইলেও ইহার ভিতরে সরল সত্য আছে, সুতরাং এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য প্রার্থনীয়।

নিরাকার নিত্য স্বরূপে সাকার তত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে, সত্য কিন্তু বহিশ্চক্ষুর দৃষ্টি দ্বারা ঐ সকল পদার্থকে প্রত্যক্ষীভূত করিয়া অসীম সসীমত্বের সাম্য দর্শন সম্ভবে না, আবার ইহাও মনে হয়, জড়জগৎ সীমাবদ্ধ হইয়াও অনন্তেই রহিয়াছে, তবে সমদর্শী [illegible] ণা যায়, প্রভাবে সাকার নিরাকারে বিরাট ব্রহ্মের যে [illegible]

তাহাতে কেনই বা আত্মার তৃপ্তি হইবে না? এক ঐশী শক্তির বহির্ভূত কোন বস্তুই ত থাকিতে পারে না।

অবশ্যই বলিতে পারা যায়, বহির্দৃষ্টির বিকার উপশমিত না হইলে যখন অন্তর্দৃষ্টি পরিস্ফুট হয় না, তখন জড়ীয় বিকার-তত্ত্বের সম্মিলন চিন্তা মানব বুদ্ধির অগম্য। বাস্তবিক তেজস্বী মনস্বীরা ইহার মূল সম্বন্ধে যতটুকু ভাবিয়াছিলেন, ততটুকুই সংসারে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অবস্থানুসারে মানব হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে, এখনও সেই সকল উপদেশ শাস্ত্ররূপে প্রকাশ পাইতেছে এবং তাহারই আন্দোলন চলিতেছে। মানব প্রবৃত্তি মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট সহসা নীচভাবেই মুগ্ধ, এজন্য উর্দ্ধে উঠিতে পারে না, হীনবল হইয়া নিশ্চেষ্টভাব অবলম্বন করে। ক্রমে ক্রমে মত বিভিন্ন রুচিভেদে প্রকৃত তত্ত্বের বিকৃতাবস্থা প্রযুক্ত কেহবা সূর্য্যাগ্নিকেই অনাদি শক্তি অভীষ্ট দেবতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন, কেহ বা প্রকৃতির পরিমিত শক্তি ধরিয়াই কৃতার্থ হইতেছেন, কেহ বা জড়বস্তু মধ্যেই ব্রহ্ম পূজার বিধান দেখাইতেছেন। এখন দেখা আবশ্যক যে, জ্যোতি সম্পন্ন সূর্য্যাদির দাহিকা শক্তি ও জগৎ সমূহের জড়ীয় শক্তি এক ব্রহ্ম শক্তি হইতেই প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং সূর্য্যাগ্নি তেজোময় সত্ত্বেও সূক্ষ্ম বা অনন্ত হইতে পারে না। ইন্ধনস্থিত অগ্নি ও সূর্য্যস্থিত কিরণ সকল কি পরিমিত নহে? কোটি কোটি সৌরজগৎ কক্ষস্থিতিভাবে বিভুর অসীম শক্তির ভিতরে অবস্থান করিতেছে, এমন সাধ্য নাই যে পরস্পর একত্র হইতে পারে।

তবেই বুঝিতে হয় যে, শক্তি ও গুণ যতই খণ্ডাধারে অর্থাৎ সীমা। -শ বিস্তৃত হউক না কেন, পরিমিতই থাকিবে।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এবং গ্রহ উপগ্রহ সকলকে একত্র করিয়া ভাবিলেও অনন্তের মধ্যে একটি সর্ষপ সদৃশই প্রতীত হয়। যেমন এক বিন্দু তৈল সমুদ্রে প্রক্ষেপ করিলে তাহার পরমাণু পরিমিত ভাবেই বিস্তৃত দেখায়, সমুদ্রকে ঢাকিতে পারে না, তেমনি আধারবিশিষ্ট শক্তিগুণও সীমাবদ্ধ বলিয়া ব্রহ্মশক্তিকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় না। সূর্য্য ও ব্রহ্মাণ্ড সমূহের শক্তি সেই গূঢ় প্রবিষ্ট অসীম শক্তি মধ্যে থাকিলেও উক্ত শক্তির ক্ষীণতা প্রযুক্ত সাম্যদৃষ্টি ঘটে না, তবেই বলিতে হয়, সাকার নিরাকারে বিরাট ব্রহ্মের দর্শন অসম্ভব। যদি সূর্য্য তেজোময় শক্তি প্রভাবে জ্যোতি স্বরূপ ব্রহ্ম হয়, তাহা হইলে আপনাদের চক্ষুর দোষ কি? অন্ধকার, আলো, সাদা, কালো প্রভৃতি পৃথক দর্শনের শক্তিদাতা কে? ঐ নিরাকার মহাশক্তি। তবেই দেখুন, ব্রহ্ম ত আপনাদের মধ্যেও প্রকাশ পাইতেছেন, একটি স্থূল বস্তুর তেজোময় শক্তি দেখিয়া উহাকে ব্রহ্ম বলিবেন কেন? পরিমিত জ্যোতিশক্তি পূর্ণ হইলে সংসারে জড়োপাসনার বিষয়ে এত চীৎকারই বা কেন হয়? আর যদি তাহাই বিশ্বাস করা যায়, তবে বৃক্ষ, লতা, ধাতু, শীলা এবং স্থূল সূক্ষ্ম সমষ্টি বিরাট ব্রহ্মরূপী এক নিত্য বস্তু নহে কেন? যখন একটি তৃণ খণ্ডের তত্ত্ব মানব বুদ্ধির অগম্য, তখন জড়বস্তুকে অচেতন ও সীমাবদ্ধ বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারা যায় না এবং ঐ বিরাটরূপ ও নিরাকার চিৎস্বরূপের শক্তির সামঞ্জস্য হইলে, পরিমিত জড় মূর্ত্তির দ্বারা ব্রহ্ম দর্শনে কেনই দ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়? সাধারণ

সূর্য্য, গ্রহ উপগ্রহ ইত্যাদি সকলি ত ব্রহ্ম। ,, ষড়ৈশ্বর্য্যবান

উত্তরে ইহাই বলিতে পারা যায়, যেমন বীজ-বৃক্ষ-পত্র

হইতেই প্রকাশ পাইতেছে, অথচ একটি পত্রকে অবলম্বন করিলে বৃক্ষে উঠিতে পারা যায় না, পত্র বৃন্ত ছিড়িয়া যায়, ইহা ক্ষীণ শক্তি ধারণ করে, তেমনি জড়ময় জগৎ এবং সূর্য্যাদি গ্রহ সকলও ভাবের তত্ত্ব; বিশেষতঃ ইহারা পরিমিত ভাবে অবস্থিত বলিয়া পূর্ণশক্তির কার্য্য করিতে সক্ষম নহে, ছায়ার ন্যায় ব্রহ্মেই স্থিতি করিতেছে। বাস্তবিক যখনই সাধকের জ্যোতিশ্চক্ষু প্রকাশ হয়, তখনই চন্দ্র সূর্য্য এবং জগৎ সকল আর দৃষ্টি হয় না, এক মাত্র পূর্ণ পরমেশ্বরের দর্শন হয়—তখন কি ঐ সকল গ্রহ ও জগৎ সত্য সত্যই ধ্বংস হয়? না। মহাদৃষ্টি প্রভাবে আর স্থূলদৃষ্টি থাকে না, কাজেই অনন্ত ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তবেই সাকার বস্তুতে সমদৃষ্টি কিরূপে সম্ভব হয়? দেবচক্ষুর উজ্জ্বল দৃষ্টি যে পার্থিব পদার্থের অতীত? এই জন্য নিরাকারবাদীরা, সাকার উপাসনা ফলপ্রদ নহে, ইহা সাধনের বিঘ্ন ও অভীষ্ট চিন্তার সময়পাঙ্ক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। একটা সূচিকার ছিদ্রে সূত্র প্রবেশ সময়ে একমাত্র ছিদ্র ভিন্ন কি সূচিকার সমস্ত অবয়ব দেখা যায়? তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশে সাকার বস্তুরও সেইরূপ অবস্থা স্থূল দৃষ্টিতেই আবার চন্দ্র, সূর্য্য ও জগৎ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ব্রহ্মের লীলা মধ্যে চেতন অচেতন উভয় পদার্থই নিত্যকাল রহিয়াছে।

অনেকেই বলিতে পারেন, তবে কি জড়তত্ত্বময় জগৎ সমূহ সৃষ্টবস্তু নহে? সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ভাব কি মিথ্যা? এই [illegible]নে ইহার উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। সৃষ্ট্যাদির তত্ত্ব তবেই মীমা[illegible] করা এক মাত্র সরল বিশ্বাসের প্রতি নির্ভর করে, [illegible] দ্বারা মীমাংসা হইতে পারে না। ভাল একটি কথা

জিজ্ঞাসা করি, ব্রহ্ম যদি অনন্ত হন, তাহা হইলে তত্ত্ব সকল কোথায় গিয়া ধ্বংস হইবে? পরমাণু সকল কোথা হইতে আসিল, কোথায়ই বা স্থিতি করিতেছে? ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি যে অখণ্ডনীয়! তাঁহারই অব্যর্থ শক্তি মধ্যে এই জড়তত্ত্বের ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে। সাকার স্থূলপদার্থ মধ্যেও এক পরমাণু হইতেই বিবিধ ভাবের আবির্ভাব হয়, আবার পৃথিবীতেই মিলিয়া যায়, ভাবিয়া দেখিলে পরমাণুর হ্রাস বৃদ্ধি ও ধ্বংসই বা কেন হইবে। সেই অমোঘ শক্তির আকর্ষণে কোন তত্ত্বই ত অপর কোন তত্ত্বকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। দেখাও যাইতেছে, এক মৃত্তিকা মধ্যে অগ্নি জল ইত্যাদি একত্র ঘনীভূত রহিয়াছে, ঐ মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছু দৃষ্ট হয় না, অথচ ভাবের প্রাবল্যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকাশ বলিয়াও তত্ত্ব বস্তুর বিচ্ছেদ নাই। এই জগৎ তত্ত্বে যে সমস্ত বৈষম্য আমরা দর্শন করিতেছি, ইহা কেবল স্থূল দৃষ্টির প্রভেদ মাত্র।

বাস্তবিক সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রভাবে স্থূল তত্ত্বের বৈষম্যে আত্মাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না; কেন না, একমাত্র কারণরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। তখন পূর্ণ পরমপুরুষের অপূর্ব্ব কৌশল স্মরণ করিয়া প্রাণ উৎফুল্ল হইতে থাকে। মনে হয়, একটি ক্ষুদ্র বীজে কি প্রকাণ্ড বৃক্ষের শক্তি ও ভাব থাকে, না কোথা হইতে আইসে? এক বিন্দু শোণিত-শুক্রের ভিতরে বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য নিহিত আছে এবং পৃথিবীর একমাত্র সত্তা হইতেই তিক্ত, মিষ্ট, কষায় প্রভৃতি রসের উদ্ভব হয়, এই সকল অলৌকিক ব্যাপার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া আত্মার তুষ্টি সম্পাদন করে। * আবার

* ইহা অষ্টৈশ্বর্য্যের মধ্যে ব্যাপ্তি ও মহিমার ভাবের তত্ত্ব, ষড়ৈশ্বর্য্যময় ঈশ্বর দর্শনের তৃপ্তি বা অনাবৃত তত্ত্বজ্ঞানের কথা নহে।

যখনই বিকারময় শুষ্কজ্ঞানের অন্ধতায় বিশুদ্ধ-প্রেম প্রচ্ছন্ন হয় ও বাহ্য বস্তুর বিবিধ প্রকার ভাবের আবেশে চিত্তকে কলুষিত করিয়া ফেলে এবং অশান্তিপূর্ণ ভ্রান্তির ভয়ানক অন্ধকারে মধ্যে ডুবাইয়া দেয়, তখনই স্থূল চক্ষে দেখা যায়, বীজ ছিল বৃক্ষ হইল, শিশু ছিল বৃদ্ধ হইল, এইরূপ বাহ্যিক মোহভাবে তত্ত্বজ্ঞান হারাইয়া চিত্ত পার্থক্য দর্শনে মুগ্ধ হয়। স্রষ্টা-স্পৃষ্ট একই ভাবে নিত্যকাল স্থিতি করিতেছে, কিন্তু পরমাণুপুঞ্জরূপ সাকার তত্ত্ব নিত্যত্ব সত্ত্বেও সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ শক্তিতেই আবদ্ধ রহিয়াছে। শাস্ত্রে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ভাবের যেরূপ ব্যাখ্যা শুনা যায়, তাহা হইতে ব্রহ্মের নিত্যনিয়মে সংশয় জন্মে। কেননা ব্রহ্মকে ছাড়িয়া জড়জগৎ কোথায় থাকিবে? তিনি যে অখণ্ড অনাদিপুরুষ। সৃষ্ট্যাদি সম্বন্ধেও গূঢ়তত্ত্ব এই যে, মানবের অবস্থাভেদে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় প্রকাশ পায়, যতক্ষণ মানবাত্মা অন্নময় কোষ অর্থাৎ স্থূল শরীরে বদ্ধ থাকে, ততক্ষণই সৃষ্টিভাব দেখিতে পায়, সাধনবলে মহাকাশ ভেদ করিয়া ব্রহ্মকে স্পর্শ করিলে স্থিতিভাবে উন্মত্ত হয়, আবার অনন্ত সত্তায় ডুবিয়া গেলে তাহাকেই প্রলয় কহে। বস্তুতঃ বাহিরের স্থূল দৃষ্টিতে যোগ বিয়োগ ভাবে জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি—প্রলয় জ্ঞান হয়, সরল ভাবে দেখিলে কোন তত্ত্বই অনিত্য নহে, সকলি ভাবময় লীলার ব্যাপার ও ব্রহ্মের অসীম ইচ্ছার তত্ত্ব; সুতরাং জগতের বৈচিত্র্য সৌন্দর্য্য নিত্যকালই রহিয়াছে। পরমাণু পরিমিত সত্ত্বেও অনিত্য নহে; ইহাতে কেবল ভাবেরই অভাব মাত্র দেখা যায়। এই যে ময়ূরটির শরীরের সৌন্দর্য্য দেখিলাম, আবার পৃথিবীর ধূলির সহিত মিশিয়া গেল, আর দেখিতে পাইলাম না; ইহাতে কি তত্ত্ববস্তু বিনাশ হইল, প্রমাণ হইতেছে?

মানবগণ, যতক্ষণ জগতের বৈচিত্র্য ভাব মধ্যে বিচরণ করে, ততক্ষণ সৃষ্টিতত্ত্বে অবস্থিতি করিতে থাকে। আবার জ্যোতিশ্চক্ষু প্রকাশ হইলে একমাত্র অনন্ত সত্তা ভিন্ন কিছুই দৃষ্ট হয় না, সুতরাং জগদ্ভাবের স্থিতি ও বৈচিত্র্য আর থাকে না, ব্রহ্মে ডুবিয়া যায়, বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। এখানে একটি আপত্তির কথা এই যে, যদি জড়ময় জগৎ সমূহ নিত্য হইল, তাহা হইলে সাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিলেও ত মুক্তি হইতে পারে? এই প্রশ্নের ভিতরে সরলভাবে প্রবেশ করিলে বুঝিবেন, যাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শক্তি ও ভাব উভয়ের মধ্যে ভাবেরই অভাব দর্শন হয়। মনে করুন, সমুদ্র নিত্যশক্তি, বিশ্ব তাহার ভাবের প্রকাশ, সমুদ্রে যে সকল উপাদান আছে, বিম্বতেও তাহাই রহিয়াছে; তবে ভাঙ্গিয়া যায় কেন? দেখিতে হইবে, ভাবেরই অভাব দেখা যায়; ঐ বিম্বই উঠিতেছে, আবার ভাঙ্গিতেছে। সাকার তত্ত্ব পরিমিত ক্ষীণশক্তি সম্পন্ন, তজ্জন্যই তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া ধরিলে পরিত্রাণ হইতে পারে না।

সংসারে দেখা যায়, মানব হৃদয়ে প্রেমভক্তির প্রবল-তরঙ্গ উত্থিত হইলে তত্ত্বজ্ঞানের অভাব হয়, তজ্জন্যই অনেকে সাকার নিরাকার তত্ত্বের এক শক্তি ভাবিয়া ব্রহ্ম দর্শন ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু তাহা সাধকের পক্ষে অতি জটিল এবং বন্ধুর পথ। কারণ স্থূল সূক্ষ্মের সম্মিলন অতীব অসম্ভব, একথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তথাপি তৎসম্বন্ধে আরও একটি কথা বলিতেছি, সাকার তত্ত্ব নিত্যত্ব সত্ত্বেও বৈষম্যের বিকাশ দোষে সাম্য যোগ মধ্যে আসিতে পারে না। একটি চতুষ্কোণ প্রস্তরকে গোলাকার ভাবিয়া লইলে কি যথার্থই তাহাকে গোল দেখা যায়? আপনি

কি শ্বেত-রক্ত প্রভৃতি পুষ্প সকলের সৌন্দর্য্য একরূপ দেখিতে পান? স্পষ্টই বলিতে পারি, বিবিধ বর্ণেরই দেখিয়া থাকেন, কেন না, ঐ সকল পুষ্পের অবস্থা ভেদে দর্শন শক্তিও ভিন্ন হইয়া যায়। অনন্ত সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রজ্ঞা-চক্ষু পড়িলে আর বস্তু বা কোন প্রকার বর্ণ দেখা যায় না, আবার সীমাবদ্ধ জগতের দিকে দেখিলে স্থূল দৃষ্টিতে অনন্তকে হারাইতে হয়। সাধকগণ, উভয় তত্ত্বকে একত্র করিতে গিয়াই স্থূল সূক্ষ্ম বিরাটরূপের বিভ্রাটে পড়েন এবং অনন্ত যোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হন।

বাস্তবিক সাকার তত্ত্বের নিত্য স্থিতি সম্ভব হইলেও সসীম অবস্থায় অবস্থিতি জন্য তদ্দ্বারা যে কিছু ভাবের ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা হয়, তাহার ভিতরে অবশ্যই অনিত্যতা অনুভূত হইবে। একটি শিশুর অভাব হইলে পর অন্য আর একটি শিশুর আবির্ভাবে ভাবের সমভাব দৃষ্ট হয় না, অথচ দৈহিক তত্ত্বের ভিন্নতা নাই, ভাবেরই স্বাতন্ত্র্য বা অনৈক্য। ইহাও চিরপ্রকাশ থাকিয়া স্থূল-জনিত বিকার দোষে কলুষিত, এজন্য সাকার তত্ত্ব মুক্তি দিতে পারে না। বাসনাদি বিকার সংগ্রামে জয়ী হইলে স্বাভাবিক যোগে ভোগসুখের আস্বাদন বুঝা যায়, নিত্যমুক্ত যোগীদিগের একমাত্র উদ্দেশ্যই অন্তর্দৃষ্টির অনন্ত যোগ।

জ্ঞানের চরম মীমাংসায় সাকার পদার্থও যে ইচ্ছা শক্তির ভাবের প্রকাশ, এ কথায় আপত্তি নাই। কিন্তু ভাব শক্তির ক্ষীণতা নিবন্ধন স্থূল সূক্ষ্ম চেতন অচেতনের সামঞ্জস্য কিরূপে সম্ভব হয়? নিরাকার জীবশক্তি হইতে দৈহিক ভাব পৃথক হইলে, ইহা জগতের পরিমিত পরমাণু মধ্যেই মিশিয়া যায়, তবেই দেখা কর্ত্তব্য যে, পদার্থগত চিন্তা ভাবব্যঞ্জক ভ্রান্তির ব্যাপার,

ইহাতে আশু সুখ দেয় বটে, ফলতঃ পরিণামে চিরতৃপ্তির অনিষ্ট সংঘটন করে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। সীমাবদ্ধ শক্তির সাহায্যে সাধনের বল গ্রহণ করা নিতান্ত ভ্রমের কথা। কোন প্রকার মূর্ত্তিকে অবলম্বন করিলে কি একটি পিপা ধরিয়া জলে ডুব দেওয়ার মত হয় না? ডুবিলেও ঐ পিপা, ভাসিলেও ঐ পিপা, তদরূপ কল্পিত জড় মূর্ত্তির আরাধনায় ধ্যানমগ্ন হইলেও ঐ নির্ম্মিত মূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। বাহিরেও তাহাই দর্শন হয়। পরিমিত স্থূল মূর্ত্তির দ্বারা অনন্তকে দেখিবার উপায় থাকে না, বরং ইহা আবরণ স্বরূপ যন্ত্রণার হেতু হইয়া উঠে।

মানব সকল, একমাত্র ব্রহ্ম কৃপাতেই আকর্ষিত হইয়া মুক্তি লাভ করে এবং বিশুদ্ধ তত্ত্ব বস্তুর অধিকারী হয়। নতুবা স্বাভাবিক ব্রহ্মকৃপার প্রতি অবিশ্বাস করিয়া কল্পিত অনুষ্ঠানের দ্বারা বদ্ধ থাকিলে, পথভ্রষ্ট পথিকের মত ক্লেশভোগ ভিন্ন অন্য কোন লাভ হয় না। বলিতে কি, সাকার মূর্ত্তির উপাসনায় অভীষ্ট লাভের ইচ্ছা, ক্লীবের পুত্রমুখ দর্শনের ন্যায় বৃথা, সেই জন্যই যোগীরা পরিত্রাণের জন্য অনন্তকেই পূজা প্রার্থনা করেন।

সংশয়-শূন্য চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, অসীম নিরাকার নিত্য শক্তিতেই সসীম জগত্তত্ত্ব সমূহ অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু তাহাতেও ত তাহাদের বিকৃত বিকার ভাব বিদূরিত হয় না। তবে কেনই বা সীমাবদ্ধ জড়ভাবে প্রলুব্ধ হইয়া প্রকৃত সারতত্ত্বে বঞ্চিত হইব, কেনই বা জড়বাদ, প্রেরিতবাদ, অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদের সংকীর্ণতায় বদ্ধ থাকিব, কেনই বা জীবন্ত জ্যোতি-স্বরূপকে স্বার্থ মতের অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিব? এইত চিন্ময় ব্রহ্ম সত্তায় সকলে স্থিতি করিতেছি। আমরা ভ্রান্তি

কুজ্ঝটিকায় দেখিতে না পাইয়া কূপমগ্ন মণ্ডূকের ন্যায় অল্প স্থানেই ঘুরিয়া মরিতেছি। অসার স্বার্থ বুদ্ধির তীক্ষ্ণধারে পূর্ণ শক্তিকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া অসীম ভূমানন্দ ভোগের ইচ্ছা করি না, ভীষণ তর্ক-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সরল সত্যের জন্য কাঁদি না, বিজ্ঞানের ক্ষণিক শক্তির আসক্তিতে হৃদয়ে সচ্চিদানন্দ প্রভুকে দেখিয়াও দেখি না,. ইহা হইতে কষ্টের কথা আর কি হইতে পারে?

হায়! যখন অনন্তযোগে সাকার তত্ত্বের অস্তিত্বই থাকে না, তখন আর পার্থিব পদার্থকে ধরিবার প্রয়োজন কি? যে বস্তু ধরিয়া ছাড়িতে হয়, তাহার আসক্তির আকর্ষণে বদ্ধ থাকা কি সঙ্গত হয়? প্রথম হইতেই ত নিত্য চৈতন্য তত্ত্বের অনুসরণ করা উচিত। কেন না, ক্রীড়া কন্দুকের ন্যায় প্রতিমাদি লইয়া সময় অতীত করার ত আবশ্যকতা কিছু দেখিতে পাই না। তবেই বলিতে হয়, পরিমিত সাকার সাধনায় অনন্তকে দর্শন করা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না।



জড়-চৈতন্য তত্ত্ব।

এই দুইটি তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকেরই মতের অনৈক্য দেখা-যায়। ভক্তগণ বলেন, জড়-চৈতন্যে অপ্রভেদ সংযোগভাব, দার্শনিক পণ্ডিতেরা বলেন, জড়ের অতীত অখণ্ড নিত্যশক্তি নিরাকার ভাব। ভক্তির দিক্ হইতে দেখিলে প্রত্যেক পরমাণুর

মূলভেদী গূঢ় শক্তির ব্যত্যয় বুঝায় না, জ্ঞানের দিকে দেখিলে জড় তত্ত্বকে ব্রহ্ম সত্তা হইতে পৃথক করিয়া ফেলে। বস্তুতঃ সাধকের গন্তব্য উভয় পথ মধ্যেই মহা শক্তির ব্যাপার নিহিত আছে, এমন স্থলে কোনটি সত্য, তাহার অন্বেষণ করা প্রয়োজন। যখন একটি বালুকণার প্রতি দৃষ্টি পড়িলে মানব বুদ্ধি পরাস্ত হইয়া যায়, তখন নিরাকার চৈতন্য চিন্তার ত কথাই নাই। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে জড় চৈতন্য কি এক তত্ত্ব? তাহাই বা কিরূপে বিশ্বাস হয়? দেহাধারে চিচ্ছক্তির প্রকাশ পাইতেছে, আবার ঐ শরীর জড়ভাবে পৃথিবীর পরমাণু মধ্যে মিশিয়াও যাইতেছে ইহাতেই বোধ হয়, চিচ্ছশক্তি অবিনাশী নিত্য হইলে জড়ের সহিত পার্থক্য থাকিতে পারে।

পূর্ণ পরমেশ্বরের অসীম শক্তির ভিতরে সসীম জড় জগৎ সকল বারিধি-ফেন খণ্ডের ন্যায় স্থিতি করিতেছে, ইহারা নিত্য শক্তি হইতে স্বতন্ত্র, এ কথা কে বলিবে? কিন্তু সেই অনাদি শক্তি জগৎপ্রপঞ্চে গূঢ় প্রবিষ্ট অখণ্ড থাকিয়াও খণ্ড ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। যেমন স্ফটিকাদি নানা বর্ণের শত খণ্ড স্বচ্ছ প্রস্তরে, এক সূর্য্যকেই বহুবর্ণে পৃথক পৃথক দেখা যায়, সেইরূপ ঐ পূর্ণশক্তিই জগতের বিচিত্রতার মধ্যে বিবিধভাবে দৃষ্ট হন। অথচ সকলের মূলে সেই সর্ব্বব্যাপিনী শক্তির অভিন্নতা সত্ত্বেও পরিমিত পদার্থেরই ক্রিয়া ও শক্তিভাব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। জড়ের বিকার বিকৃত দৃষ্টি কিছুতেই বিদূরিত হয় না। নির্ম্মল জলে যদি এক বিন্দু সিন্দুর প্রক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে রক্তবর্ণ ভিন্ন কি আর সেই নির্ম্মল জল দেখা যায়? সুতরাং জড়ত্বের বৈকারিক শক্তির বিশেষত্ব থাকিবেই থাকিবে।

বৃক্ষ লতা গুল্ম এবং পশু পক্ষী মানবাদির দৈহিক শক্তির তারতম্য খণ্ডন করা যায় না। ঐ বেতসী লতা অল্প উঠিয়াই ভূতলশায়িনী হয় ও বট বৃক্ষটি গগন ভেদ করিয়া বহুদূর অধিকার করে, পিপীলিকা সর্ষপ সদৃশ ক্ষুদ্র দ্রব্য বহন করিতে পারে, হস্তী প্রকাণ্ড বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলে। ফলতঃ এই সকলের মধ্যে এক ঐশী শক্তিই কার্য্য করিতেছে বলিয়া দৈহিক শক্তিরও পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। কাজেই স্থূলে ও অনন্তে সম্মিলন হইতেই পারে না, এ জন্য গভীর চিন্তাশীল যোগীগণ বাহ্য বস্তুতে চিত্তকে আকৃষ্ট হইতে না দিয়া প্রজ্ঞাবলে অনন্তেই অবস্থিতি করেন।

সংসারে "দর্শন" সামঞ্জস্যের অভাব বশতঃ সরল সত্য প্রকাশ পাইতেছে না, ইহার কারণ শুষ্ক জ্ঞানের পরিণাম ফল তর্ক-যুক্তি। অনেকেই ইহার তীব্র তরঙ্গে পড়িয়া জড় ও চৈতন্যের সমন্বয় করিতে চেষ্টা করেন। ভাল, ঐ অট্টালিকার সম্মুখে পীতবর্ণের মৃণ্ময় মৃগ ও হরিদ্বর্ণের ময়ূর দুইটির প্রতিকৃতি রহিয়াছে ; প্রথমতঃ ময়ূরটির প্রতি তন্ময় অর্থাৎ যোগদৃষ্টি স্থির হইলে হরিণটি থাকে না এবং ময়ূরের লক্ষ্য স্থান ব্যতীত কিছুই দৃষ্ট হয় না। আবার মৃগটির প্রতি লক্ষ্য করিলে ময়ূরটিও অদৃশ্য হয়। সেইরূপ স্থূলে দৃষ্টি পড়িলে অনন্তের দর্শন ঘটে না, অনন্তকে দেখিলে স্থূল ডুবিয়া যায়, তবে পরিমিত জগতের বিচিত্র ভাব মধ্যে ভ্রমণ করিবার প্রয়োজন কি ? এ স্থলে অবশ্যই বলিতে পারা যায়, জড়চৈতন্যে সম দৃষ্টি বিড়ম্বনা মাত্র। মানবের প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মেষিত হইলে, বহির্জগৎ আর কোন বাধা দিতে পারে না, সসীমত্ব তত্ত্বের অস্তিত্ব কোথায় থাকে ? মর্ম্মঘাতিনী বহিশ্চিন্তার

আক্রমণে জড়ীয় পরিমিত বস্তুতে এত আসক্তি শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হয় না। সেই অন্তর্ভেদী অনন্ত ব্যাপিনী শক্তি ভিন্ন ত কিছুই দেখা যায় না, এমত স্থলে "ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" ইহাতে ঘুরিয়া মরা বড়ই আক্ষেপের কথা।

চিন্ময় অসীম ব্রহ্মে রূপ কল্পনা করিলে সাধকের হিত হয়, এটি বড় সংশয়ের বিষয়। বরং স্পষ্টই বলা যাইতে পারে, উটি সাধকের সাধন সম্বন্ধে বিঘ্ন ও অহিতেরই ব্যবস্থা। সূক্ষ্মভাবে ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায়, নিরাকার অখণ্ড শক্তির কল্পনা সীমাবদ্ধ স্থূল পদার্থ মধ্যে হইতে পারে না, ইহাতে কি অসীমত্বের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি সম্ভব হইতে পারে? একটি ক্ষুদ্র কূপে উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রকে কল্পনা করিয়া কি দেখা যায়? ঐ মুষীকটি কি যথার্থই প্রকাণ্ড দিগ্‌গজ বলিয়া প্রতীয়মান হয়? ব্রহ্মত সকল প্রকার জড়ীয় বস্তুর অতীত, নিরাকার অনন্তময়। অতঃপর কল্পনার আবরণে তাঁহাকে বদ্ধ করা নিতান্ত ভ্রমের কথা। বাস্তবিকই কোন প্রকার মূর্ত্তি কল্পনা দ্বারা সাধন পথের সাহায্য করিতে হইলে অসত্যেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কেন না, ঐ মুগ্ধকারিণী শক্তির আপাত মধুরভাব কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারা যায় না। সুতরাং প্রকৃত সত্যকেও শুষ্ক ও নীরস বলিয়া বিবেচনা হয়। কল্পনা-প্রিয় পণ্ডিতেরা নিষ্কলঙ্ক উজ্জ্বল সত্যকেও অসত্য-প্রহেলিকার ভূষণে ভূষিত করিয়া তুষ্টি সম্পাদন করেন, এবং পরিমিত স্থূলতত্ত্ব মধ্যেই অসীম ব্রহ্ম দর্শনের নানাবিধ যুক্তি প্রমাণে প্রলুব্ধ হইয়া পরিতৃপ্ত হন। এই জন্য আশুতৃপ্তি-দায়িনী কল্পনা, জ্ঞানী ও ভক্ত উভয় সম্প্রদায়কেই অধিকার করিয়াছে। বিশেষতঃ সরলহৃদয় ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই ভাবুকতায়

অধীন হন, তন্নিমিত্ত তাঁহারা ব্যাপ্তি * ও মহিমার ‡ অনুসরণ-প্রিয় হইয়া পড়েন।

যথার্থই যখন ভক্তগণের হৃদয়ে উন্মাদিনী ভক্তি প্রবল হয়, তখন তাঁহাদের প্রাণে ভাবুকতার তরঙ্গ উদ্বেলিত হইতে থাকে। জগতের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিহ্বল হইয়া তাঁহারা তাহাতেই মগ্ন হইতে থাকেন এবং কল্পনা-প্রসূত বিকার বিভীবিকায় জাগত পদার্থ মধ্যেই অসীম জ্যোতিস্বরূপকে দেখিবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহা অভ্রান্ত ব্রহ্মদর্শন নহে। কেননা সেই অনন্ত শক্তির প্রতি অনাবৃত জ্যোতিশ্চক্ষু পড়িলে জড়-জগতের কিছু দেখা-যায় না, সুতরাং ঐ বিরাটরূপ দর্শনও বিড়ম্বনা।

ভক্ত সাধকগণ উন্মাদিনী ভক্তির শক্তিতে আকৃষ্ট হইলে বিশুদ্ধ তত্ত্ব হারাইয়া ফেলেন, সেইজন্য স্বরূপ ও ভাবের তারতম্য বুঝিতে সমর্থ হন না। জগতের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য যে সীমাবদ্ধ, ইহাও তাঁহাদের প্রাণে স্থান পায় না। কাজেই জ্ঞানশূন্য ভক্তির আবেগে ঐ রূপ দৃষ্টি করিয়া থাকেন। হায়—নিরাকার চৈতন্যস্বরূপের ভাবের উচ্ছ্বাস জড়তত্ত্ব মধ্যেও দর্শন-সাপেক্ষ! সীমাবদ্ধ স্থূল পদার্থ মধ্যে অনন্তকে দর্শন করা যে ভাবুকতার মত্ততা, ইহা কে না স্বীকার করিবেন? সরল বিশ্বাসী ভক্তগণ

---

* সর্ব্বত্র গমন করিবার ক্ষমতা। যিনি সর্ব্বব্যাপী অনন্ত, কোথায় এমন স্থান আছে যে তিনি আবার ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন।

‡ স্বীয় শরীরকে স্থূল করিবার ক্ষমতা। নিরাকার চিচ্ছক্তির শরীর কেন। পরমাণু সমষ্টি জগৎ ও প্রত্যঙ্গভাব সমস্তই মায়াশক্তির বিকাশ ভাবের তত্ত্ব। পরিমিত পদার্থে অসীম শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারে না, এই নিমিত্ত অনন্তের স্থূল দেহ অসম্ভব।

ক্ষীণশক্তিসম্পন্ন জগৎ সকল সমুদ্র বুদ্‌বুদের ন্যায় ব্রহ্মসাগরে ভাসিতেছে বুঝিয়াও ঐ জগত্তত্ত্বের আপাত মধুর ভাবে মুগ্ধ হন। ভাবেন না যে, উহা অসম্পূর্ণ ক্ষণিক তৃপ্তির হেতু এবং ভীষণ পরীক্ষা ও ভ্রান্তির ছায়া। যেমন কাঁচপাত্রে দীপকলিকার প্রতিবিম্বিত-শক্তি কিছুই নয় তেমনি জাগত পদার্থ সমূহে স্বরূপের আরোপ করাও বৃথা হয়। পাত্রাবস্থিত পারদবৎ ব্রহ্মের স্থিতি হইলে, চিচ্ছক্তির সহিত জড়ের মিলন অতি অসম্ভব।

মনে করুন, আপনার সম্মুখে একটি বৃক্ষ ফলপত্রে সুশোভিত রহিয়াছে, তাহার ছায়াটিও ঠিক ঐ রূপ ভাবে অবস্থিত। বৃক্ষটির শাখা পত্র ফল নড়িতেছে, ছায়া বৃক্ষেরও ঐরূপ অবস্থা দেখিতেছেন, এখন ফলাকাঙ্ক্ষায় ছায়া-ফল ধরিলে কি যথার্থই আপনি প্রকৃত ফল ধরিতে পারেন? কখনই নয়। তবে ধরা যায় না কেন? জানিবেন, বৃক্ষ হইতেই ভাবরূপ ছায়া, প্রকৃত বৃক্ষ নহে। জড় চৈতন্যেও সেইরূপ সম্বন্ধ।

এস্থলে একটি সংশয়ের কথা মনে পড়িল। এক সময় কোন ধর্ম্মবন্ধু, একজন বৈষ্ণব ভক্তের কথা বলিতেছিলেন। কথাটি এই, একেশ্বরবাদীরা তুষটি পরিত্যাগ করিয়া কেবল সারটি গ্রহণ করিতে চান। ভাবিয়া দেখিলে সারে তুষে একত্র না রাখিলে গাছ হয় না, ফলও পাওয়া যায় না। কথাটিতে বড় সংশয় জন্মিল। কিছু কাল চিন্তা করিয়া দেখিলাম—কেন? সারে তুষে জড়িত থাকিয়াও ত পৃথক! তুষ যে আবরণ, খোষা মাত্র। দেখিতে পাই, অচেতন ভৌতিক তত্ত্বময় শরীরবস্তুও সর্পশল্কবৎ অসার বস্তু। বোধ হয়, এই কথাটি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, এক জন আত্মযোগনিষ্ঠ যোগী অনন্ত যোগে সমা-

ধিস্থ হন। জগতের লোক,পরীক্ষা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার শরীরে অগ্নিসন্তপ্ত লৌহশলাকায় দাগ দেয় এবং তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা স্থানে স্থানে রক্তপাতও করে, কিন্তু সমাধিস্থ যোগী কিছু-তেই বিচলিত হন নাই, সুমেরুপর্ব্বতের ন্যায় স্থির রহিয়াছেন; তখন তাঁহার দেহস্থিত চৈতন্য কোথায় ছিল? ঐ শরীটিকে অচেতন জড়-পদার্থ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? ইহাতেই বুঝা যায়, চৈতন্য তত্ত্ব জড় হইতে পৃথক। একেশ্বরবাদীরা যে ভ্রান্তি খোষা পরিত্যাগ করিয়া সার শক্তিকে গ্রহণ করেন, তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারা যায় না।

আবার ইহাও স্বীকার করি, জড়তত্ত্ব যে ব্রহ্মশক্তির বহির্ভূত, তাহাও নহে, কিন্তু পরিমিত স্থূল বলিয়া অসীম পূর্ণ পরমপুরুষের ভিতরে থাকিয়াও তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না, সমুদ্রবিম্বের ন্যায় প্রকাশ পায়। তবেই বলিতে হয়,তত্ত্বজ্ঞানের অভাবেই জড়-চৈতন্যে সামঞ্জস্য ও সাম্যদর্শনের ইচ্ছা হইয়া থাকে। আক্ষেপের কথা যে, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও ঐ উন্মাদিনী ভক্তির ভাবাবেশ মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, ব্রাহ্ম সাধকগণের এ বিষয় সতর্ক হওয়া প্রার্থনীয়। নিশ্চয়ই জানিবেন ইহা হইতেই পৌত্তলিক ধর্ম্ম, সংসারকে গ্রাস করিয়াছে, ভাবাবেশেই ধর্ম্ম বিপ্লব দেখা যায়, ঐ সকল বিষম বিপজ্জনক ব্যাপারেই প্রকৃত সত্য প্রচ্ছন্ন হই-তেছে। সূক্ষ্মদর্শী মনিষীগণও সাকার নিরাকার বিরাট মূর্ত্তির দর্শন বিভ্রাটে, বৈজ্ঞানিক ইন্দ্রজাল যোগে, ভেদ-কলুষিত ভক্তিতে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। অধ্যাত্ম জগতে স্থিতি করিয়াও মায়ার কৌশলে বিচলিত হইয়া পড়িতেছেন, সুতরাং প্রভুত্ব, ও সম্মানগৌরবে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে না।

হায়! মত্ততা-প্রমত্ত প্রেম ও উন্মাদিনী ভক্তির শক্তি কি ভয়ানক! কিছুতেই চিত্তকে জ্ঞানপথে বিচরণ করিতে দেয় না। মহাভক্ত চৈতন্য সময়ে সময়ে এই প্রাণশূন্য মত্ততা-প্রমত্ত প্রেমে মূর্চ্ছিত হইতেন এবং উন্মাদিনী ভক্তির ভীষণ তরঙ্গে অধীর হইয়া পড়িতেন। সত্যের অনুরোধে এ কথা অবশ্যই বলিতে হইবে, যত দিন তিনি নিরাকার নিত্য শক্তির ভাবের প্রকাশ জীবশক্তিকে অখণ্ড লীলাভাবে মহাভাবতত্ত্বে বুঝিতে পরেন নাই, ততদিন তত্ত্বজ্ঞানকে প্রাণে পূজা করিতে সমর্থ হন নাই। ভক্ত সাধকগণের প্রাণের কথাই স্থূল-সূক্ষ্মে সার্ব্ব-ভৌমিক দর্শন, তাহাকেই তাঁহারা প্রকৃত বোধ করেন।

ঘননিবিষ্ট মনে চিন্তা করিয়া দেখিলে, পার্থিব পদার্থ মধ্যে নিরাকার অখণ্ড শক্তির আরোপ করা অতি অসম্ভব। যোগীগণ সেই জন্য ধ্যানস্থ হইয়া জড়ীয় স্থূল দৃষ্টির বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হন। জ্যোতিশ্চক্ষুর উজ্জ্বল দৃষ্টিতে মহামিলন যোগে মজিয়া যান। তখনি দেবদত্ত প্রেম, অপ্রভেদ ভক্তির মধুর তত্ত্ব বুঝিতে পারেন। এখন বেশ বুঝিবেন, জড় ও চৈতন্যে কত প্রভেদ। আচ্ছা! তাই যেন হইল, তবে ঐ দেখুন—পাখীটি উড়িতেছে, ছেলেটি গান করিতেছে, অশ্বটি দৌড়িয়া যাইতেছে, এ সকল কি চৈতন্য লীলার প্রত্যক্ষ নয়? জড়েও ত চিচ্ছক্তির প্রকাশ দেখা যায়। ইহার উত্তরে অধিক বলিবার নাই। পদ্মপত্রে জলের ন্যায় ব্রহ্মের স্থিতি বিশ্বাস করিলে কিছুরই সংশয় থাকে না। এই পার্থিব শরীর যদি চৈতন্যস্বরূপে অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংযুক্তই থাকিত, তাহা হইলে ইহা কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হইত না।

ঐ যে কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের কার্য্য দেখিতে পাই, তাহা জড়ের নহে, মনের ব্যাপার। ব্রহ্মের ত অনাহত শব্দ নিরাকার মনোবৃত্তির ভিতর দিয়া ধ্বনিত হয়। রূপ, রস, গন্ধাদির অনুভব করে কে? ইন্দ্রিয়গণ না মন? তবেই মন, জড় ও চৈতন্য উভয় তত্ত্বেই আকর্ষিত। ঐ বাবুটির ঘড়ীটী লইতে মনের ইচ্ছা হইল, অমনি বাষ্পীয় কলের মত শরীরের ইন্দ্রিয় সকল ঝোঁক দিয়া উঠিল, পা, চলিতে লাগিল; হাত, ঘড়ীটি গ্রহণ করিল, জিহ্বা, গান করিয়া সকলকে জাগাইল। আবার যখন মন চৈতন্যের মধ্যে ডুবিয়া গেল, তখন শরীর ও ইন্দ্রিয় সকলের সাড়াশব্দ নাই, তাহারা অচেতন জড়। তবেই জানা যাইতেছে, জগতের ও দৈহিক-তত্ত্বের অন্তর্ভেদী সূক্ষ্ম শক্তির অসীম চৈতন্য লীলা জড়ের অতীত। সেই পূর্ণ পরমানন্দময় ব্রহ্ম, অনন্ত আকাশ ভেদ করিয়া পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন সুতরাং স্থূলে ভুলদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে, আত্মাতে পরমাত্মার দর্শনই ধ্রুব সত্য। অহো! এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সত্ত্বেও ব্রহ্মাণ্ডের লতায় পাতায় ঘুরিয়া মরি, ইহা বড়ই দুঃখের কথা।

অনেকেই অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদরূপ সীমাবদ্ধ শাস্ত্র গণ্ডির অতীত সত্যের জন্য লালায়িত হন না। স্বাভাবিক ব্রহ্ম কৃপাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। জানেন না যে, জ্যোতিশ্চক্ষু তত্ত্ব জ্ঞানই পথ প্রদর্শক; ঐ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে হৃদয়ের মোহ ভ্রান্তির আবর্জ্জনা পরিষ্কার হইয়া যায়, বায়ু নিরোধাদি বিকৃত ক্রিয়া পদ্ধতির আবরণ আর থাকে না। ব্রহ্মের আকর্ষণই স্বাভাবিক যোগ, ইহা বুঝিতে পারিলে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালত্রয় এবং জড় চৈতন্য তত্ত্বের সার-

মর্ম্ম প্রাণে প্রকাশ পায়। তখনি আত্মা পরমানন্দ সাগরে ডুবিয়া যাইতে থাকে।

শক্তিতত্ত্ব।

শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যেও মতের বিভিন্নতা দেখা যায়। এক পক্ষ বলিতেছেন এই যে অনন্ত আকাশে সৌরজগতের স্থিতিভাব, ইহা দুইটি শক্তিতে বিভক্ত। কেন্দ্রাপকর্ষণী শক্তি ও কেন্দ্রাভিকর্ষণী শক্তি। একটি কেন্দ্র হইতে দূরে লইয়া যায়, আর একটি কেন্দ্রের দিকে টানিতে থাকে। এই উভয়বিধ শক্তিতে জগৎ সকল আকৃষ্ট রহিয়াছে ও গতি স্থিতি করিতেছে। একথায় প্রাণ তত তৃপ্তি হইলনা, কেননা, কোটি কোটি সৌরজগৎ একত্রীভূত হইলেও তাহার শক্তি পরিমিত ও দুর্ব্বল। মনে করুন, আপনি দশটি বন্ধুর সহিত অত্যুচ্চ প্রাসাদ শিখরে উঠিয়াছেন, পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া উপর্য্যুক্ত উভয় শক্তির অবলম্বনে আকাশে স্থিতি ইচ্ছা করিলে সত্য সত্যই কি তাহা ঘটে? না পড়িয়া যান; সেইরূপ জগৎ সকল কি অনন্তকাল পড়িয়াই যাইতেছে? অন্যপক্ষ বলিতেছেন, এমন একটি শক্তি সকলের মূলে কার্য্য করিতেছে, যাহা সীমাবদ্ধ নহে। ইহা বলিয়াও তাহারা তাহাকে ঐশী শক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। ভাল, এ কথাটাও বড় আশ্চর্য্যবাদ, আমি বলি। যদি ঐ শক্তিকেই অসীম-বলিয়া স্বীকার করা হইল, তবে উহাকেই কেন ঈশ্বর বলা যাক্

না? ইহাতে সুখ, শান্তি, প্রেম অধিক পাওয়া যায়। সেই সর্ব্ব ব্যাপিনী মহাশক্তির আশ্রয়ে প্রাণীপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড সকল স্থিতি করিতেছে, সাধ্য কি যে কক্ষ ভেদ করিয়া বিন্দুমাত্র স্থান অধিকার করিতে পারে?

মানব প্রকৃতি পরিমিত জড় বিজ্ঞানের অধীন, সহসা ক্ষণস্থায়ী বৈদ্যুতিক বা কোন প্রকার ঐন্দ্রজালিক ঘটনায় মুগ্ধ হইয়া পড়ে। মূল শক্তিকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া পরিমিত পদার্থগত ব্যাপারের মত্ততায় ব্রহ্মবিজ্ঞানের প্রতি বীতস্পৃহ হওয়া বড়ই আক্ষেপের বিষয়। ঐ শক্তিটিকে ঐশীশক্তি মানিয়া লইলে ত মহা বিজ্ঞানতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে এবং ব্রহ্ম যে অনন্ত বিজ্ঞানময়,তাহাও বুঝিতে সংশয় থাকে না।

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা শক্তিতত্ত্বকে তিনভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, মায়াশক্তি। চিত্তত্ত্বে জ্ঞান, জীবতত্ত্বে প্রেম, মায়াতত্ত্বে ইচ্ছা। ইহার ভিতরেও তিনটি মধুর তত্ত্ব আছে, স্বরূপ, ভাব, উচ্ছ্বাস। কিন্তু এরূপ বিশুদ্ধ দর্শন সত্ত্বেও কেহ বা মায়া শক্তির কার্য্যকে প্রত্যক্ষ ভাবিয়া মায়াবাদ স্বীকার করেন, কেহবা জগতের অনুপম সৌন্দর্য্যে বিহ্বল হইয়া জড়বাদে কৃতার্থ হন, কেহবা শুষ্ক সোঽহং জ্ঞানে অদ্বৈতবাদে ডুবিয়া যান। এইরূপ ব্যক্তিগত মতের অসামঞ্জস্য হেতু দর্শন শাস্ত্র সকল জগতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইয়াও নিষ্প্রভ ভাব প্রদর্শন করিতেছে।

নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে শুষ্ক জ্ঞানই প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে জটিল ভাব বুঝাইয়া দেয় এমন কি চার্ব্বাক নিরীশ্বরবাদকেও আক্রমণ করে। আবার হিন্দুশাস্ত্র অসীম ঐশী শক্তি স্বীকার

করিয়াও ইহাকে পরিমিতরূপে খণ্ড খণ্ড রূপে দেখাইতেছে ও নিরাকার জীবশক্তিকেও সৃষ্ট বলিয়া প্রমাণ করিতেছে। যাহা হউক, যোগীর অনাবৃত সরল জ্ঞানের আশ্রয়ে একণে স্বরূপ ও জীব শক্তির বিষয় প্রথমতঃ দেখা আবশ্যক। চৈতন্য স্বরূপের ভাবের প্রকাশ জীবাত্মা, কেননা, অখণ্ড চিত্ত্বের ভাবতত্ত্ব * জীবত্বও নিত্য; তাহাকে সৃষ্ট বা খণ্ড বলিয়া ব্যাখ্যা করা অতি অযুক্ত। সংসারে অহং জ্ঞানের প্রভাবে ভূরি ভূরি শাস্ত্র সকল প্রকাশ পাইয়াছে; তাহারা মত-বৈষম্যের গভীর অন্ধকারে এবং স্বার্থবৃত্তির কঠোর দৃষ্টিতে পরস্পরকে পরাস্ত করিয়া ফেলে, সুতরাং মূল তত্ত্বের বিমল রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া,তাহাদিগকে ভয়ানক পাপ প্রবৃত্তির অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। ক্রমে ক্রমে সংশয়বাদ আসিয়া বিশুদ্ধ চিত্তকেও পাপ কলুষিত ইন্দ্রিয়াদির ঘৃণিত ভাবের মধ্যে ডুবাইয়া দেয়। এইজন্য আত্মজ্যোতি প্রকাশ পায় না; বরং জাগ্রত জীবস্থ তত্ত্বের প্রতি অনাস্থা আসিয়া পড়ে এবং ভীষণ তর্ক যুক্তির উত্তেজনায় বন্ধুর পথে উপস্থিত হইতে হয়। বাস্তবিক স্থূলদৃষ্টির তীক্ষ্ণ ধারে নিরাকার অসীম শক্তিকেও খণ্ড বিখণ্ড করিতেছে; দেহাধারে জীব তত্ত্বকেই বা কেন পৃথক পৃথক করিবে না।

পূর্ণ পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তির প্রকাশ জীবশক্তি, ইহাও তরু লতা সমাকীর্ণ বিচিত্র জগতের গূঢ় প্রবিষ্ট রসের ন্যায় কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী মানবাদি সকল প্রকার শরীর যন্ত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই অভেদ জীব শক্তিকে যোগীরা সমদৃষ্টির

* ইহা দুই প্রকার, একটি স্বরূপ চৈতন্যময় নিরাকার তত্ত্বের জীবভাব, আর একটি পরিমিত স্থূলতত্ত্বের জড় ভাব।

ভিতরে রাখিয়া কৃতার্থ হন। সার্ব্বভৌমিক দর্শন কি? প্রত্যক্ষ-ভেদী মহাশক্তির ভাবতত্ত্ব জীবের অখণ্ড দর্শন। বিকার চক্ষুর স্থূল দৃষ্টিতে নিরাকার জীব তত্ত্বকে স্পষ্ট ও ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলে কখনই পৃথক বা স্থূলের ন্যায় পরিমিত বলিয়া বোধ হয় না।

এস্থলে অনেকেই এই প্রশ্নটিকে জটিল ও অশ্রুত মত বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন, যে হেতু ব্রহ্মের ভাবশক্তি জীবাত্মার প্রমাণ হইলে, দুঃখ শোক জরা মৃত্যু এবং সুখ শান্তি আনন্দ প্রভৃতি ভোগের পার্থক্য ব্যক্তি বিশেষে প্রকাশ পাইতেছে, রোগ স্বাস্থ্য, সাধুতা অসাধুতার তারতম্যই বা কেন প্রত্যক্ষ হয়? ঐ কীটটি পদদলিত হইতেছে, সম্রাট্ উচ্চ সিংহাসনে বসিয়া আছেন, এমত স্থলে জীবের অখণ্ড ভাব বুঝিতে হইলে ভোগাদির স্বতন্ত্রত্ব ইহা কি সাম্যভাবে পরিগৃহীত হইতে পারে?

ইহার উত্তরে স্পষ্টই বলিতে পারা যায়, নিরাকার শক্তিকে কেমন করিয়া ক্ষুদ্রভাবে দর্শন করিবেন? জীব-জড়িত অনন্তের মধ্যেই ত জড় শরীরময় প্রাণীপুঞ্জ একই ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। এই ব্রহ্মভাবময় জীবতত্ত্বকে পৃথক করিতে হইলে নিরাকার নিত্য বস্তুর ব্যত্যয় হয় না? এক মহাশক্তিই চিৎ ও জীবভাবে প্রত্যেক দেহাধারে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, ইহা কি সত্য নহে? আমিত্বের আবরণ ঘুচিয়া গেলে কীটে সম্রাটে বিভিন্ন বুঝা যায় না এবং সুখ দুঃখ ইত্যাদি ভোগাভোগও মঙ্গল ঘটনায় পরিণত হয়। তখন এক মাত্র ব্রহ্মই "তুমি আমি" রূপ মধুর লীলায় নিমগ্ন থাকেন। এখন ভাবিয়া দেখুন, তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে মহালীলায় ঐ উভয় তত্ত্বকে অনন্ত ব্যতীত আর কিছুই

বলা যায় না। আবার ইহাও বলি, এইরূপ দ্বিবিধ অসীমত্বের মূলে হয় ত চিচ্ছক্তির জীবত্ব তত্বের মত্ততায় অদ্বৈতবাদ আসিতে পারে। যাহা হউক, জীবত্ব ধ্বংসকারী প্রখর সোঽহং জ্ঞানের বিচার অপেক্ষা জীবশক্তিকে অখণ্ডভাবে জীবিত রাখিতে দোষ কি ?

মহাজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈত মতে জীবশক্তিকে ক্ষুদ্র বা পরিমিত ভাবে রাখিতে না পারিয়া ব্রহ্মাহং নিত্য এই নীরস জ্ঞানে উড়াইয়া দিয়াছেন। ফলতঃ এটি বড়ই কঠোর ও শুষ্কভাব। আবার জীবতত্ত্বকে অসীমত্বে আনিলেও কর্ম্ম নিবন্ধন ভোগাভোগ টেঁকে না, স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইতে থাকে। অবশ্যই আপত্তি উঠিতে পারে যে, জীবাত্মা যদি অখণ্ড হয়, তাহা হইলে পূজা, প্রার্থনা, ধ্যান যোগাদিরই বা প্রয়োজন কি ? সাধু অসাধু, ধনী দরিদ্র সকলেরই ত সমভাব, আর কোন প্রকার বিশেষত্ব রহিল না।

দেখুন, ব্রহ্মের এক ইচ্ছা শক্তি হইতেই জগৎ প্রপঞ্চ উৎপন্ন বিষ সুধা, পাপ পুণ্য দুর্গন্ধ সুগন্ধ, প্রভৃতির মধ্যেও এক ঐশী শক্তিপ্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে, যেহেতু সকলি ঈশ্বরের ইচ্ছা শক্তির তত্ত্ব, এমন কোন স্থান আছে যে ঐ সমস্ত বস্তু অনন্ত শক্তির বহির্ভূত থাকিবে। ইহাতে মনে হয়, গ্রহ নক্ষত্র জগৎ সকল অনাদি কালই রহিয়াছে, বিচিত্রময় বৃক্ষলতা ও পশু পক্ষী মানবাদিও সমুদ্র বিম্বের ন্যায় আসিতেছে যাইতেছে। * বস্তুতঃ

* এই অবস্থাকে পণ্ডিতেরা জন্মান্তর বলেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে জীবশক্তির জন্ম মৃত্যু হয় না। কেন না, নিরাকার শক্তি মরিবে আর বাঁচিবে কি ? মূলতত্ত্বেরও হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। উদ্ভিজ্জ ও মানব প্রভৃতির অবয়ব ভাব তাহা

গূঢ়ভাবে চিন্তা করিলে ইহাই অনুভূত হয় যে পরমাণু পুঞ্জ সমভাবে আছে, যোগ-বিয়োগ ব্রহ্মের অমোঘ ইচ্ছা, সকল প্রকার তত্ত্ব মধ্যে ব্রহ্মেরই ক্রীড়া হইতেছে।

এস্থলে বুঝিবেন, চৈতন্যস্বরূপের ভাবশক্তি জীবাত্মার জন্মমৃত্যু হইলে নিরাকার নিত্যশক্তি টেঁকে না। একমাত্র পরমাত্মা জীবভাবে দ্বৈতাদ্বৈত মধুর লীলা করিতেছেন। এজন্য জীবত্বের অসীমত্ব এবং অচেতন স্থূল পরমাণুরও নিত্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তবে যে আমরা জগতে দৈহিক ভাবের বিবিধ শক্তি ও ভাব অর্থাৎ সীমাবদ্ধ বস্তুর ভাবে অসীম মহাশক্তিকে খণ্ড খণ্ড করি, তাহা স্থূল চক্ষের ভ্রান্তি দৃষ্টি। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ স্রোতস্বতীর বক্ষ ভেদ করিয়া সমুদ্র-প্রবাহ (জোয়ার) প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, কিন্তু ঐ নদীসমূহের অবস্থা ভেদে শক্তির তারতম্য হেতু সমুদ্রের পূর্ণ শক্তির কি ব্যত্যয় হইতেছে? আমি বলি, না। আরও বুঝুন, হরিৎ পীত লোহিতাদি বর্ণের কাচপাত্রস্থিত ঘৃত নানাবর্ণে দৃষ্ট হয় বটে, বাস্তবিক কি তাহার প্রকৃত অবস্থা বিকৃত হয়? এইরূপে অনন্ত কাল জড় ও চিচ্ছক্তির কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।

এই ত গেল জ্ঞানের পথ। আবার ভক্তির পথে গেলেও জীব শক্তিকে ক্ষুদ্র ও সৃষ্ট বলিয়া প্রমাণ হয় না। মহাভক্ত চৈতন্য অখণ্ড ভাবে "কি জন্য জীবে ভক্তি" করিয়াছিলেন? তিনি ভাগবতি জ্ঞানে নিরাকার জীবতত্ত্বকে খণ্ড করিতে পারেন নাই,

---

ও পরমাণুর সহিত মিশিয়া একই ভাবে পরিণত ; ঐ পরমাণুই আবার নানারূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমিত্বের উত্তেজনায় সংশয় পথে ভ্রমণ করিতে হয়।

সেই কারণে যবন হরিদাসকে বুকে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অস্ত্রধারী বধোদ্যত চণ্ডালকে অবিচ্ছিন্ন প্রেমে কোল দিয়াছিলেন, বাস্তবিক যখনই প্রত্যেক প্রাণীর বহির্ভাব ভেদ পূর্ব্বক নিরাকার নিত্য শক্তির দিকে দৃষ্টি পড়ে, তখনই জীবভাব সমভাব হইয়া যায়। বাহিরের মায়াময় বিবিধ প্রকার শরীর কান্তি বিলুপ্ত হইয়া যায় ও সেই অনুপম সৌন্দর্য্যে হৃদয়কে বিমোহিত করে, ঐ উদার সাম্য দর্শনে ভক্ত সাধকগণের প্রাণ উৎফুল্ল হইতে থাকে।

আচ্ছা, তাই যেন বুঝিলাম। কিন্তু ইহাও সত্য যে জীবশক্তি যদি অখণ্ড নিত্য হইল, তাহা হইলে কেহবা পূজা প্রার্থনা করে, কেহবা আনন্দে উন্মত্ত হয়, কেহ বা দুঃখ সন্তাপের অশ্রুজলে ভাসিয়া যায়।

প্রশ্নোত্তরে একটুকু নিবিষ্ট চিত্ত হইলে, সহজেই জানা যায়, আমিত্বের অধিকার পরিহার করিতে পারিলে আর কি থাকে? একমাত্র মহাশক্তি। শুভাশুভ, ভ্রান্তি, শান্তি, জরা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি অনন্ত শক্তি মধ্যে বিচরণ করে ও সদসৎ প্রবৃত্তিরও ভোগ ব্রহ্ম সত্তাতে প্রকাশ পায়, কেন না, ব্রহ্ম ভিন্ন ত কিছু থাকিতে পারে না, অথচ সকল তত্ত্বই মঙ্গলময়। সুতরাং সচ্চিদানন্দ প্রভুই পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃত্বে ও দাস্য বা পুত্রত্বে মহা মিলন যোগরসে বিহার করিতেছেন। একমাত্র ব্রহ্মই মহাভাবের মহালীলায় আপনাকে আপনি ভোগ করিয়া থাকেন, "তুমি আমি" ইহাও কেবল উপাধি মাত্র। যেমন তুষার জল নামের প্রভেদ, বস্তু এক; তদ্রূপ অহন্তাবাদি বিকার হইতে বিমুক্ত হইলে সাম্যদৃষ্টিতে সকলি এক শক্তির ব্যাপার বলিয়া বিবেচনা হয়, প্রভেদ ভাব আর থাকে না।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, জগতে প্রত্যেক প্রাণী ও সকল প্রকার পদার্থ মধ্যে ক্রিয়া, শক্তি, ভাব ভিন্ন ভিন্ন দেখা যাই-তেছে, ইহাতে কি শক্তি তত্ত্বের সমতার ব্যত্যয় বুঝায় না? পশ্বাদি মানব পর্য্যন্ত শ্রেণী বিভাগে রুচির প্রভেদ, কার্য্য প্রণালীর অনৈক্য, পরস্পর প্রকৃতির অসামঞ্জস্য প্রকাশ পাইতেছে, এ সকল কি খণ্ড শক্তির ব্যাপার নহে? উনি অতি জ্ঞানী, ধার্ম্মিক, দয়াশীল; আমি অজ্ঞানী, কঠোর, পাপী; স্বাতন্ত্র্যের ত ঐটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। এবং উদ্ভিজ্জ ও ধাতু তত্ত্বের মধ্যেও বিবিধ বৈষম্যের পরিচয় পাওয়া যায়, এ সকল দৃষ্টি করিয়া সাম্য তত্ত্বের মীমাংসাকে বিশদ বলা যাইতে পারে কি?

অল্প কথাতেই বুঝা যায়, জড়ের অন্ধ শক্তি সতত সাম্য-বিরোধী হইয়া, স্বার্থ প্রবৃত্তি দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে বিপদগ্রস্ত করিতেছে, এজন্য অসাম্য ভাবে ইচ্ছাশক্তিও ম্লান ও দুর্ব্বল হইতেছে। পৃথিবীতে অধিকাংশ প্রাণীকে ঐ বৈষম্যের অনুযাত্রী দেখা যায়, যাঁহারা স্বার্থান্ধ বিকার শক্তিতে বদ্ধ নহেন, তাঁহারা কখনই প্রভেদভাবে বিচলিত হন না। জগতে ভাব ও শক্তির পার্থক্য যাহা দৃষ্ট হয় তাহা জড়ীয় স্থূল চক্ষুর ব্যাপার, কেন না, সাম্যদৃষ্টিতে বৈষম্যভাব কিছু থাকে না, সক-লই সমান হইয়া যায়। কোন প্রকার ভেদ কলঙ্ক আর আসিতে পারে না।

বাস্তবিক ঈশ্বরের তত্ত্ব বা শক্তির মূল বুঝিতে গেলে অবাক্ হইতে হয়, এই জন্য কেহ বা নিরীশ্বরবাদী হন, কেহ বা জড়বাদী হইয়া পড়েন। পূর্ব্বে যে চিৎ ও জীবশক্তির কথা উল্লেখ করা

গেল, তৎসম্বন্ধে আরও অনেক বলিবার আছে, এক্ষণে মায়া-শক্তির বিষয় কিছু বলিতেছি। নির্গুণ * নিরাকার নিত্যশক্তিতেই সগুণ ভাব বর্ত্তমান আছে। সগুণ হইতে মায়া, ঐ মায়া শক্তি মধ্যে কোটি কোটি জগৎ সকল প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু এক অচিন্ত্য অনাদি অনন্ত শক্তি, গ্রহ, উপগ্রহ ও সমস্ত জগত্তত্ত্বের মূলে গূঢ় প্রবিষ্ট থাকিয়া স্থিতি করিতেছে।

এখন দেখা আবশ্যক, সগুণ ব্রহ্মের ইচ্ছার উচ্ছ্বাসে মায়া। তৎস্থিত জগৎ সমূহ পরিমিত ও স্থূল শক্তির ভাবে যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,এবং জড়তত্ত্ব সংকীর্ণ শক্তিতেই বা আকর্ষণ করে কেন, ইহার মর্ম্মভেদ করিলে ইহাই বিবেচনা হয়, নির্গুণ ব্রহ্মশক্তির ভোগ ও আস্বাদন অনুভব করিবার জন্য সম্মুখে বিভীষিকাময়ী অবিদ্যার আবরণ রহিয়াছে। তাহা না হইলে বিচিত্র লীলা-জগতের গৌরব থাকিত না, মানবের হৃদয়কে অনিত্য জগৎ সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট করিতে পারিত না, পৃথিবীতে অসংখ্য কল্পনার ছবিও স্থান পাইত না। যাহা হউক, এখানে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, শক্তিতত্ত্বেরই অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া প্রার্থনীয়। এক ঐশী শক্তি যখন সাকার নিরাকার উভয় তত্ত্বে স্থিতি করিতেছে, তখন স্থূল জড়ের শক্তিকে পরিমিত ও বিকার কলুষিত বলিয়া ব্যাখ্যা করা কি সম্ভব হয়? এই সংশয়বাদের প্রশ্নসম্বন্ধে পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে সগুণ ব্রহ্মের ইচ্ছার উচ্ছ্বাসে মায়াশক্তি পরিমিত স্থূলে নিবদ্ধ,তদ্ধেতু পার্থিব পদার্থ সকল ব্রহ্ম লীলার উপাদান সত্ত্বেও ভ্রান্তি ও সংকীর্ণ শক্তিতে পোষিত।

* নিরাকারে দর্শন থাকিলে নির্গুণেও গুণ আছে। তিনি পূর্ণ, গুণের অতীত, এই অর্থে নির্গুণ।

ইহা হইতেই ত অহম্ভাব বিকাশ পায়, সুতরাং স্থূলতত্ত্ব ধরিলে অসীম মহাশক্তির জীবন্ত তত্ত্ব হারাইতে হয়। যেমন ক্ষুদ্র মেঘের আচ্ছাদনে প্রকাণ্ড সূর্য্যকে দেখা যায় না, তেমনই সীমাবদ্ধ পদার্থ সকলও অনন্ত শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারে না, স্থূলতত্ত্ব দেখিতে হইলে পরিমিত ভাবই দৃষ্ট হয়। আবার ইহাও প্রমাণ হয় যে একটি তৃণখণ্ডকে ধারাবাহীরূপে চিরকাল ছেদন করিতে হইলেও খণ্ডত্বের শেষ করা যায় না, তবে স্থূলতত্ত্বকে পরিমিতই বা বলি কেন? ভাবিয়া দেখিলে ঐ খণ্ড পরমাণুই সীমাবদ্ধ মূলশক্তির বলে যত কালই খণ্ড বিখণ্ড হউক না, পৃথক পৃথক ভাবে স্থিতি করিবেই করিবে। এই নিমিত্ত তদ্দ্বারা পূর্ণশক্তির কার্য্য সম্পন্ন হওয়া নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা হয়।

আমরা বুঝি না যে মঙ্গলদাতা বিধাতা মোহবিকারময় সাকারভাবেও পাত্রে পারদবৎ আপনাকে আপনি স্পর্শ করেন না, প্রাণী সম্বন্ধেও তাদৃশ বিধান স্পষ্ট রহিয়াছে, ভ্রান্তিকুজ্ঝটিকার আবরণ ঘুচাইতে পারিলে জীবত্বের উজ্জ্বল তত্ত্ব প্রকাশ পায়, তথাপি সংসারের বিবিধ প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া পতঙ্গের ন্যায় পাপানলে দগ্ধ হইতেছি, ইহা কি পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের পক্ষপাতিতার কার্য্য? এ কি কখন হইতে পারে? ব্রহ্মের ভাবস্বরূপ জীবশক্তি জগতের বিকারভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেই কঠিন আবরণে প্রকৃত জ্যোতি প্রকাশ পায় না, সুতরাং স্থূল চক্ষে তাহাকে ক্ষুদ্র ও পৃথকভাবে দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ ইহাতেই ভীষণ আমিত্বজ্ঞান প্রবল হইয়া আপন পর, শত্রু মিত্র, বিভিন্ন ভাব আনিয়া দেয় এবং উদার সরল তত্ত্ব সকল কলুষিত করে। ঐ ভয়ঙ্কর অহংজ্ঞানের প্রখর তেজে সাত্ত্বিক গুণ ম্লান হয়, রাজসিক

তামসিক গুণ বর্দ্ধিত হইতে থাকে; দ্বেষ, হিংসা, আত্মম্ভরিতা দুষ্প্রবৃত্তি দ্বারা চিত্তকে অধীর করিয়া তুলে। দুর্দ্দমনীয় অহং শক্তির হুঙ্কারে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে,হৃদয় ভ্রান্তির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, এমন অবস্থায় কি প্রকারে জীবশক্তির মধুর তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়? সংসারে এই জগদ্বৈচিত্র্যের মাধুর্য্যে, সার্ব্বভৌমিক উদার তত্ত্বের জন্য কয়টি লোকের অশ্রুজল পড়ে? না, অসার অনিত্য বস্তুর তৃপ্তিকেই যথেষ্ট মনে হয়? হা! মায়াময়ী পৃথিবীর আসক্তি কি ভয়ঙ্কর! মন বুদ্ধি শ্রুতি চক্ষু ইন্দ্রিয়াদি নিয়ত উহারই মুগ্ধকারিণী শক্তির ভিতরে ডুবিয়া সারতত্ত্বকে পরিত্যাগ করে। কি শোচনীয় দুর্গতি!

এখন দেখা যাক্ জড়ীয় বিকারভোগের অধিকারী কে? এই গুরুতর প্রশ্নের বিষয় চিন্তা করিলে মনে হয়, যখন এক মহাশক্তি সগুণ নির্গুণ,সাকার নিরাকার রূপে নিত্য, তখন বিকার নির্ব্বিকার ইহাও ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে? পাপ পুণ্য ঘটনার মূলেও যে দিকে দেখা যায়, এক মূল শক্তিরই অধিকার। এস্থলে বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মই স্থূল সূক্ষ্ম উভয় তত্ত্বের আস্বাদন ভোগ করিতেছেন। নিরাকার জীবতত্ত্বে লিপ্ত সাকারতত্ত্বে পাত্রাবস্থিত পারদবৎ নির্লিপ্ত, এই অস্পর্শ শক্তিকে যোগীরা "কামাবশায়িতা" ঐশ্বর্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এখন বলিতে পারেন ব্রহ্ম যদি জীবে লিপ্ত ও জড়ে নির্লিপ্ত থাকিলেন, তবে দুঃখ যন্ত্রণা পাপ-তাপাদির দায়ী কে হইবে? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের উত্তেজনায় সীমাবদ্ধ জড়ীয়শক্তিতে অহংজ্ঞান প্রবল হয়; সুতরাং অবিদ্যার কঠোর যন্ত্রণা ভোগ তাহারই অধিকার। ঐ বিকারবিকৃতজ্ঞানই ভ্রান্তির দুর্ভেদ্য

আচ্ছাদনে জীবশক্তিকে আচ্ছন্ন করে। বাস্তবিক মোহময় অহংজ্ঞান প্রভাবে বিকার ভাবের বিকাশ পায়, তাহাতে জীবত্বের নিত্যত্ব ও নির্ম্মল জ্যোতি অনুভূত হয় না। যেমন দীপ্তিময় দিবাকরকে ঘন নীলবর্ণ অস্বচ্ছ প্রস্তরে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ ঘোর আসক্তিপূর্ণ দেহাবরণে জীবাত্মাকেও নিষ্কলঙ্ক দেখা অতি অসম্ভব। আবার ইহাও বিবেচনা হয় যে সাধন ও অধ্যবসায় দ্বারা দেবভাবের আবির্ভাবে ঐ কলুষিত হৃদয় পরিষ্কৃত হইলে, স্ফটিকপ্রস্তরভেদী সূর্য্যরশ্মিবৎ আত্মজ্যোতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।* এই উভয়বিধ অবস্থাকে আত্মার সুকৃতি দুষ্কৃতি বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। জীবশক্তি যে বিকার নির্ব্বিকারভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে ইহা কেবল বর্ণসম্পৃক্ত অগ্নিবৎ বস্তুভেদ মাত্র। আত্মার এরূপ অবস্থাতেও দেবশক্তি ঐ মোহময় অহংজ্ঞানকে পরাভূত করিয়া ইহাকে প্রতিমুহূর্ত্ত আকর্ষণ করিতেছে। নিরাশার কথা নহে, শৈবালদামপূর্ণ সরোবরের আবর্জ্জনা সকল ঘুচিয়া গেলে নির্ম্মল জলে সূর্য্যমণ্ডল কি দেখা যায় না? তবেই বুঝা যাইতেছে মহাশক্তিজড়িত জীবশক্তি, অনন্তকাল নিত্য ভাবেই প্রকাশিত আছে।

চিৎস্বরূপে বাসনা নির্মুক্ত জীবশক্তির নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল ভাবকে মহাভাব বলে। কিন্তু এমন বিশুদ্ধভাবও জ্ঞানীদলে স্থান পায় না। তাঁহারা জড় বিজ্ঞানের আতিশয্য বশতঃ তাড়িৎ-

---

* অহংজ্ঞান ও ভোগবাসনাদি কিছু থাকে না, এইরূপ অবস্থাকে জীবন্মুক্ত কহে।

সঞ্চালন* প্রক্রিয়াযোগে অর্থাৎ ইন্দ্রজাল প্রভাবে বৈদ্যুতিক পরিঃ ষিক্ত শক্তিকে আত্মার গতি স্থিতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন এবং জীবশক্তিকে মানব প্রকৃতির অবস্থাভেদে উন্নত, অবনত, শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট, সাধু অসাধুভাবে গ্রহণ করেন। চিন্ময় অনন্তশক্তিতে যে জীবশক্তি অখণ্ডভাবে প্রকাশ পাইতেছে তাহা কেহ বুঝিয়া দেখেন না। আহা! জীবজড়িত ব্রহ্মলীলা কি মধুর! সকল প্রকার দেহাধারে একই শক্তির কার্য্য হইতেছে, অথচ প্রাণী বিশেষে শক্তি, ভাব, ক্রিয়াদির নিয়ম বিভিন্ন; তাহাও অখণ্ডনীয়। মানবের ব্যবস্থা পশু পক্ষীতে, পশু পক্ষীর ব্যবস্থা উদ্ভিজ্জে নাই। এই অব্যর্থ ইচ্ছার শৃঙ্খলা কেমন সুন্দর! পণ্ডিতেরা বলেন, পশ্বাদি নির্দ্দিষ্ট বহুবিধ জ্ঞানে পরিচালিত হয়, মানব উন্নতিশীল, এজন্য বিধাতা প্রত্যেক মানবকে অপ্রভেদ মানবীয় শক্তির অধিকারী করিয়াছেন। এরূপ বিধানেও মানুষ, সম্বন্ধ বিষয়ে অন্ধ হইয়া পাশব বৃত্তির অধীন হইতেছে, "তেহমীমানুষরাক্ষসাঃ" স্বার্থমুগ্ধ ক্রব্যাদ সদৃশ অসার রাজ্য সুখ লালসায় সহস্র সহস্র প্রাণীর প্রাণ সংহার করিতেছে। এমন কি শতগ্রন্থি ছিন্নবস্ত্রাবৃত দুঃখীরও ভিক্ষার-মুষ্ঠনে তাহাদের অরুচি দেখা যায় না। এই ভ

* বিজ্ঞানবিৎ যোগীরা (ইস্পিরিট) জীব বা আত্মার পৃথক পৃথক ভাবে পরস্পরে শক্তি সঞ্চালন স্থির করিয়া হঠযোগ বলেন, তাহা নহে। আত্মা অনন্তব্যাপী সে আসিবে আর যাইবে কোথায়? তবে শরীরস্থ বৈদ্যুতিক-শক্তি প্রক্রিয়া দ্বারা অন্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। বলিতে কি, একটি বৃদ্ধের কার্য্য-শক্তি তাড়িৎ আকর্ষণে অল্পবয়স্ক শিশু হইতে প্রকাশ পায়। বায়ু যেমন গন্ধ বহন করিতে পারে, তেমনই তেজস্বিনীশক্তি তাড়িৎ ক্রিয়াযোগে কার্য্যশক্তি চালনা করে, ইহাকেই হঠযোগ বলে।

গেল এক দিক, অন্ত দিকে আবৃত অনাবৃত জ্ঞানের প্রাবল্যে কেহ বা নিশ্চেষ্ট, পরপিণ্ডভোগী, অদূরদর্শী,কেহ বা আত্মশক্তি বর্দ্ধনাকাঙ্ক্ষী দূরদর্শী, কেহ বা সরল প্রকৃতি সম্পন্ন সাম্যদর্শী, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে কি বুঝিবেন, এ সকল ঈশ্বরের বিধান ? কখনই বলিতে পারা যায় না। ঈশ্বর এমন পক্ষপাতী নহেন যে রঘুবর ওঝাজীকে পণ্ডিত করিলেন আর তন্নিবৎ-লেখকে মূর্খ করিয়া রাখিলেন। এস্থলে অবশ্য বলিতে পারা যায়, জড়ীয় অন্ধশক্তির অন্ধকারে সৎপ্রবৃত্তি সমূহ প্রচ্ছন্ন হইলেও ইচ্ছা শক্তির উত্তেজনায় মেঘ-নির্মুক্ত সূর্য্যবৎ প্রভান্বিত হইয়া উঠে ; কেবল অসার ভোগ সুখের পিপাসায় স্বাভাবিক তত্ত্বজ্ঞান হারাইয়া দেবভাবে উদাসীন হইতে হয়। ভাবিয়া দেখিলে, পিতার পুত্রত্ব সত্ত্বে সমভাবে সকলেই ত স্বত্ববান, সুতরাং ঈশা, মুসা, মহম্মদ, বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য,কবীর প্রভৃতির মধ্যে যে সকল সাধুশক্তি শুনা যায় তাহা প্রত্যেক মানব হৃদয়েই নিহিত আছে, তাহা প্রাণগত সাধনবলে ফুটিয়া উঠে। সৎস্বরূপ সদ্‌গুরু সকলের মধ্যে অবস্থিত করিতেছেন, আমিত্ব অন্ধকারে তাঁহাকে দৃষ্ট হয় না। অগ্নি যেমন প্রস্তর খণ্ডে দেখা যায় না, অথচ লৌহ শলাকা দ্বারা আঘাত করিলে শত শত স্ফুলিঙ্গ সকল ছুটিতে থাকে, তেমনই কঠিন মানব হৃদয়কেও যদি সর্ষপকণা সদৃশ পবিত্রতা স্পর্শ করে, অমনি সাধুশক্তি সমূহ জলন্ত জ্যোতিতে প্রকাশ পায়। পৃথিবী তৎপ্রতি অন্ধ—ব্যক্তিগত অসম্পূর্ণ সাধু শক্তির আকর্ষণে ওটি বুদ্ধধর্ম্ম, এটি চৈতন্যধর্ম্ম, ঐটি খ্রীষ্টধর্ম্ম, এই বুঝিয়া উন্মাদিনী ভক্তির তীব্র স্রোতে অজস্র ভাসিতেছে। হা! ঐ সকল শরীর যন্ত্রে প্রভুশক্তি স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল বলিয়া কি মানুষের ধর্ম্ম হইতে

পারে? ধর্ম্ম যে অনন্ত নিত্যশক্তিপূর্ণ। ঐ মোহ দৃষ্টিতেই ত অখণ্ড শক্তিকে খণ্ড বিখণ্ড হইতে হইয়াছে, মানুষকে প্রভু করিয়া তুলিতেছে, অপ্রভেদ জীবতত্ত্বকে পৃথক করিতেছে।

হায়! অগাধ বুদ্ধিমান মহানুভবগণও প্রাণের ভিতরে গূঢ় সত্যের অন্বেষণে যত্ন করেন না। ব্যক্তি বিশেষে এক একটী শক্তির প্রকাশ দেখিয়া তাহাকে ঈশ্বরের অবতার ও অভ্রান্ত গুরু বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। প্রত্যেক হৃদয়ই যে অভিন্ন শক্তির আধার, তাহা কেহই মনে স্থান দেন না। গৃহ-প্রোথিত অমূল্য রত্নকে না দেখিয়া অনেকে দুর্ব্বল ও মলিন ভাবে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছেন, ইহা বড়ই দুঃখের কথা।

হে তত্ত্বজ্ঞগণ! ভাবিবেন না যে সাধুশক্তির উচ্চ আদর্শকে উপেক্ষা করা হইল। সাধুশক্তি কি, একবার চিন্তা করিলে মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক হৃদয়ও প্রেমের তরঙ্গে ভাসিয়া যায়। বুঝিবেন, এক মূলশক্তিতেই সকল শক্তি প্রকাশ পাইতেছে, জীবতত্ত্বেও তাহাই প্রতিফলিত হইতেছে। সাধু, গুরু, মহাজনাদি উপাধিতত্ত্ব সকলি অসীমাত্মক, নিত্য। অপূর্ণ মানব কিরূপে এই দৈব-উপাধি গ্রহণ করিবে? সংসারে ব্যক্তি বিশেষে সাধু অসাধু বাচাই নহে। আকাশ যেমন ঘটের অবস্থা ভেদে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র দৃষ্ট হয়, তেমনই দেহের উন্নতি অবনতি সূত্রে অনন্ত শক্তিকেও বিভিন্ন দেখা যায়, কিন্তু প্রজ্ঞা-চক্ষুর উজ্জ্বল দৃষ্টিতে ভ্রান্তিময় ঐ স্বতন্ত্রত্ব আর থাকে না। কীট পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত সকলেরই মধ্যে এক অখণ্ড অনাদি শক্তি রহিয়াছে, স্বাভাবিক যোগ-বিশ্বাসী সাধক মাত্রই তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা সর্প-শম্বুবৎ শরীরভাবকে পরি-

ত্যাগ করিয়া দেব-প্রকাশিত অভ্রান্ত সাধু শক্তিকে প্রাণে, পোষণ করেন ও তাহাতেই সাধন সিদ্ধ হইয়া কৃতার্থ হইতে থাকেন। একমাত্র ব্রহ্মই প্রভু, গুরু, মহাপুরুষ। ব্যক্তি মাত্রই যদি নিজকে পাপী ও দীন ভাবেন তাহা হইলে সকলেই বিশুদ্ধ স্বর্গীয় তত্ত্বের অধিকারী হন। বিষম বিপজ্জনক গুরু বা আচার্য্য প্রভৃতির উচ্চ সম্মান ভোগের ইচ্ছা আর থাকে না। সকলের মধ্যেই আমি ও আমার প্রভু; অন্যকে আঘাত করিলে কাঁদিয়া উঠিব এবং সম্মান অহঙ্কারকে হৃদয়ে অধিকার করিতে না দিয়া উদার প্রেমে জগতের সেবা করিব। ইহা না করিয়া বরং পাপ তাপের যন্ত্রণা দিতেছি, এরূপ দীনভাবই সাধু ভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হায়! মেদ পুরীষাদিপূরিত শরীর ধারণ করিয়া সাধু মহাপুরুষ হইবে কিরূপে? সকলের নীচ না হইলে যখন দেবশক্তি প্রকাশ পায় না, তখন সাধু গুরু বা আচার্য্য এই সকল উচ্চ সম্মান লইয়া কি ব্রহ্ম দর্শন হয়? অন্তর্জগতে প্রবিষ্ট হইলেও বহির্জগতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্মান সুখের আবর্ত্তে পড়িয়া, ভ্রম-মরীচিকাময় অসার পার্থিব তত্ত্বের শক্তি সঞ্চালন যে যন্ত্রণা ভোগ; তাহা অবশ্য বুঝিতে পারেন। ঐ নিরক্ষর ক্ষত বিক্ষত রুগ্ন ভাইটী ও মহাজ্ঞানী সুস্থ ধ্যান-পরায়ণযোগী, উভয়ের ভিতরেই সদ্‌গুরু পরব্রহ্মের লীলা তুল্যরূপে হইতেছে, যিনি দর্শন করেন তিনি অপ্রভেদ জীব শক্তির মধুর তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হন। উনি সাধু, ইনি অসাধু, এই ভেদ ভাবের ভক্তিই ত সাধন পথের বিরাট বিভীষিকা—সূক্ষ্মভাবে দেখিলে এক ঈশ্বরই সকলের মধ্যে মহাশক্তিরূপে স্থিতি করিতেছেন। দৈহিক ভাবের

পরিমিত দর্শনই ভ্রান্তির হেতু; আপনার ও আমার ভঙ্গুর শরীর দুইটী অগ্নিতে দগ্ধ হইলে কি থাকিবে? ভস্ম বা ছাই। মেদরক্তময় দেহ-বিশিষ্ট গুরু শিষ্যেরও ত সেইরূপ অবস্থা। সেইজন্ত বলিতেছি, চিন্ময় নিত্যগুরুকে প্রাণে না দেখিয়া পার্থিব পরিমিত শরীর ভাবে আরোপ করা নিতান্ত ভ্রমের কথা। বিবেকের উজ্জ্বল উপদেশ উপেক্ষা করিয়া ভেদভক্তি দ্বারা চিত্তকে কলুষিত করা কি উচিত হয়? কাহারও সাধ্য নাই যে ব্রহ্ম শক্তির বহির্ভূত কোন কার্য্য করিতে পারেন। সেই পূর্ণ পরমেশ্বরের অমোঘ শক্তির আকর্ষণে সকলই আকর্ষিত। সাধু গুরু প্রভু ইত্যাদি দেব উপাধি মধ্যে এক অখণ্ড শক্তিই প্রকাশ পাইতেছে। আবার কীটাদি মানবাধারেও সেই অসীম জীবশক্তি একই ভাবে বিদ্যমান আছে। স্থূল দৃষ্টি ঘুচিয়া গেলে সকলি এক মহাশক্তির ব্যাপার ভিন্ন কিছুই নয়। এই মহাজ্ঞান প্রভাবে জানা যায়, পূর্ণ শক্তিময় অনন্তই জীবত্বের মহাভাবে বিহার করিতেছেন। অসীমাকাশে অবিচ্ছেদ পিতা পুত্র বা সেব্য সেবকের নিত্য লীলা হইতেছে, বিরাম নাই ধ্বংসও নাই। যাহা হউক, এখন জীবভাবে এক হইয়া মহা মিলনে প্রভুর চিরসেবায় মগ্ন থাকিতে পারিলেই ত জীবন্মুক্ত হওয়া যায়!



স্বাভাবিক ব্রহ্মজ্ঞান।

'চিৎ' জ্ঞান বা চৈতন্য স্বরূপ। কেমন করিয়া এই অনন্ত তত্বকে বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে বুঝাইবে? এবং জটা-বল্কলধারী দেবর্ষি মহর্ষি, ফকির সাঞী ইহারাও ত পরাস্ত; কারণ মানবীয় ভাষা-বুদ্ধির অতীত সেই ব্রহ্মজ্ঞান নিত্য, এমন সাধ্য কার আছে যে ইহা আয়ত্ত করিবে। মানব হৃদয় যতটুকু দেবভাবে নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক হইতে পারে, ততটুকু স্বাভাবিক ব্রহ্মজ্ঞানকে ধারণা করিতে সমর্থ হয়। অনেকে তাহাই অভ্রান্ত শাস্ত্রের উপদেশ ভাবিয়া গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ মানবের স্বাধীন ইচ্ছা বশতঃ নানা প্রকার স্বার্থে কলুষিত। শাস্ত্র অথবা ঋষিবাক্য দ্বারা তত্ব জ্ঞানের কথা কিছু প্রাপ্ত হইলেও তাহা নিম্ব মিশ্রিত শর্করার ন্যায় বিবেচনা হয়। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব ও যজ্ঞাদি বিধানের অন্তর্প্রবিষ্ট ভাবে প্রচ্ছন্ন থাকে না, সুতরাং মানবীয় স্বাধীন ইচ্ছার প্রলোভনে তাহা ধারণা করা অসম্ভব। ব্রহ্মই ইহা স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন। স্পষ্টই দেখুন, জন্মান্ধ যেমন দুগ্ধ কেমন চেনে না অথচ পান করিবা মাত্র তাহার আস্বাদন বুঝিতে পারে, সহসা বলিয়া উঠে আঃ—কি মিষ্ট, জ্ঞান তত্বেরও অবস্থা সেইরূপ। মানুষ ইহা স্বাভাবিক ভাবেই লাভ করিতে পারে।

যদি বলেন, এ কথায় তত বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। সংসারে ব্যক্তি পরম্পরায় শিক্ষা আলোচনা দ্বারা কত উন্নতি দেখিতেছি, একখানি "ভূগোল" পাঠ করিলে পৃথিবীর সমস্ত

প্রদেশের রীতি, নীতি, ব্যবহারাদি অনায়াসে বলিতে পারা যায়। বিজ্ঞানের অসামান্য প্রভাবে দেশলাই দ্বারা আগুনের কার্য্য সুবিধা মত সম্পন্ন হয়, টেলিগ্রাফে বিলাতের খবর অল্প সময়ে কলিকাতায় আইসে, বিদ্যুদ্গতি স্থির হইয়া রাজ-পথের স্থানে স্থানে আলোক দান করিতেছে, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত গণের বুদ্ধি কৌশলে ও অপূর্ব্ব যন্ত্র সাহায্যে নানা পদার্থযোগে অস্থি রক্তাদির সৃষ্টি কথাও শুনিতে পাই, এ সকল ব্যাপার কে অগ্রাহ্য করিবে? কিন্তু বস্তুগত বিজ্ঞানের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নাই। ব্রহ্মজ্ঞান স্বাভাবিক, ইহা কোন বস্তুযোগে পাওয়া যায় না ও কাহাকে শিখাইয়া দিতেও হয় না। ঐ অপোগণ্ড শিশুটির কোমল শরীরের কোন স্থানে সূচিকাগ্র দ্বারা একটুকু আঘাত করিয়া আপনি তাহাকে কি বলেন, "শিশু! তুমি কাঁদিও না"? সে আপনা হইতেই যাতনা বুঝিয়া কাঁদিতে থাকে। সে কাঁদে কেন? ভিতরে কে জানাইয়া দেয়?

এই সমস্ত বিষয়ের অনুসরণ করিতে গেলে জড় বিজ্ঞান ও মহাবিজ্ঞান উভয় তত্ত্বেরই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। প্রথমতঃ দেখা যাক্, জড় বিজ্ঞান কি বলিতেছে? ইহা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে কি না? জড়ের ভিতরে আমরা যে কিছু জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাই তাহা সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। জড়তত্ত্বময় জগৎ সকল পরিমিত সত্বে মহা বিজ্ঞান তত্ত্বকে গ্রহণ করিতে পারে না, পরস্পর বস্তুর যোগ সংঘর্ষণে ঐ বিজ্ঞান শক্তি ও বিকৃত ভাবে বিকাশ পাইয়া থাকে, এই কারণে উহা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। বস্তুতঃ বস্তুগত বিজ্ঞানশক্তির দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত তদ্দ্বারা মহা জ্ঞানের অধিকারী হওয়া অতীব

অসম্ভব। যদিও এক ব্রহ্ম বিজ্ঞান হইতে পার্থিব পদার্থ মধ্যে অনেক প্রকার অদ্ভূত পূর্ব্ব ব্যাপার দৃষ্ট হয় তথাচ তাহা স্থূলে পরিণত। অনেকে তাহাতেই বজিয়া যাইতেছেন, ভাবিয়া দেখেন না যে জড়ীয় বিকার দোষে ঐ সকল বিজ্ঞানব্যাপারে আপাততঃ মুগ্ধ করে বটে, কিন্তু তাহা সীমাবদ্ধ বলিয়া মহা বিজ্ঞানের নিকট দুর্ব্বল। কূপস্থিত মণ্ডূক যেমন সাগর উল্লঘন করিতে পারে না, পরিমিত বিজ্ঞান সাহায্যেও মানুষ তেমনই ব্রহ্ম জ্ঞানের আশ্রয় লইতে সমর্থ হয় না, এই নিমিত্ত জড় বিজ্ঞানের ক্ষণস্থায়ী দুর্ব্বল শক্তি দ্বারা কিছু হয় না।

মানবের চিন্তাশক্তি, জড়ের অন্ধ শক্তিতে অন্ধীভূত হইয়া বিবিধ ভাবে ভ্রমণ করে, ব্রহ্ম বিজ্ঞানতত্ত্ব ধরিতে সক্ষম হয় না। সর্ব্বব্যাপিনী শক্তিতে স্থূলতা বোধ যে ভুলের কথা ও তদ্দ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভবে না, এ বিষয় সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মচিন্তা উভয়ই স্বাভাবিক—অস্বাভাবিক পরিমিত পদার্থ কর্তৃক চালিত নহে, ইহাদের গতি আকাশভেদী এক মাত্র অনন্তে। এই মহা বিজ্ঞান চিন্তার মধ্যবর্ত্তী আর কেহ নাই, ইহা ব্রহ্মকৃপাতে আপনি ফুটিয়া উঠে। আহা! মানব হৃদয়ে যদি সর্ষপ সদৃশ স্থানে পবিত্রতা থাকে, তাহা হইলে অখণ্ড ব্রহ্ম জ্ঞানের উজ্জ্বল তেজে সকল প্রকার পাপ তাপ আসক্তির আবর্জ্জনা ভস্মীভূত হইয়া যায়। তখন হৃদয়েস্থালাবৃত সিক্তি হইয়া পাপ সন্তপ্ত চিত্ত মোহ আবরণ হইতে মুক্তি লাভ করে, বাহিক বিজ্ঞান তত্ত্ব ভুলিয়া যায়, ব্রহ্মবিজ্ঞান বলে গোলোকের কথা ভূলোকে আনিতে পারে। অসীমানন্দময় ব্রহ্ম বিজ্ঞানের আলোকে প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠে। তবেই

বেশ বুঝা যাইতেছে, পদার্থ-গত পরিমিত বিজ্ঞানে তত্ব জ্ঞানের কিছু সাহায্য করিতে পারে না, বরং ইহাতে ক্ষণস্থায়ী ক্ষীণ শক্তির বশীভূত রাখিয়া অসীম মহা শক্তির প্রতি নিশ্চেষ্ট ভাব প্রদর্শন করে। অনেকে বস্তুর যোগ শক্তির অকিঞ্চিৎকর অলৌকিক ঘটনা আর ছাড়িতে পারেন না, এই কারণে ব্রহ্মজ্ঞান ত টেকেই না, ঐশীশক্তিও পরাভূত হইয়া যায়।

জগতে পণ্ডিত ও সাধক দুই শ্রেণীর লোক আছেন, তাহার মধ্যে পণ্ডিত বিভাগে যুক্তি ও তর্ক জ্ঞানের প্রবল আধিপত্য, সাধক দলে স্বাভাবিক তত্ব জ্ঞানেরই পূজা বেশী। এই উভয়-বিধ জ্ঞানী সম্প্রদায় মধ্যে যুক্তিবিৎ পণ্ডিতেরা কুশাগ্রস্পর্শী বুদ্ধিবলে কখন ঈশ্বরের অস্তিত্বেই সন্দেহ আনিয়া দেন, কখন মাটির শিবলিঙ্গ ধরাইতেও ছাড়েন না, কিন্তু সরল ভাব সম্পন্ন সাধক বা যোগীগণেরা সেরূপ নহেন, তাঁহারা তত্বজ্ঞানের বিশুদ্ধ কিরণে অতি দীন ও কাঙ্গাল হইয়া যান এবং বিদ্যার অহঙ্কারকে পদ দলিত করিয়া ব্রহ্ম সত্তায় ভাসিতে থাকেন। "স্বার্থনাশন্ত বৈরাগ্যম্"এই মধুর তত্বের মর্ম তাঁহারা বুঝিতে পারেন। নিঃস্বার্থ প্রেম, অহৈতুকী ভালবাসা, অপ্রভেদ ভক্তির মাহাত্ম্য ঐ সকল সরল যোগী হইতে প্রকাশ পায়, স্বর্গের যেকিছু বিশুদ্ধ ভাব তাঁহারাই বাহ্য জগতে প্রচার করেন। স্বাভাবিক যোগী ও সাধকের অবস্থা এক—একথা কেন বলিতেছি, ইহারা যে সরল তত্বজ্ঞানের ভিখারী। তাঁহারা বেদ তন্ত্র পুরাণ প্রমাণ বুঝেন না, পরব্রহ্মের আদেশ মাত্র অন্তরেই লাভ করিয়া থাকেন। স্বার্থ-কলুষিত অসার কর্ম-জনিত বিবিধ মতকে প্রকৃত বলিয়া জানিতে ইচ্ছাও করেন না। করিবেনই বা কেন? যে তত্ব হৃদয় তিন্ন বাক্য

দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না, কে এমন অভ্রান্ত শক্তিশালী ব্যক্তি আছেন যে তাহা বুঝাইতে পারেন? আবার একথাও সত্য যে সাধকগণের পবিত্র হৃদয়েও ব্রহ্মতত্ত্ব বিকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু তাহাও সেই অস্ফুট অনুপমেয় তত্ত্ব তাঁহাদের বুঝাইবার সাধ্য নাই। যে বুঝিয়াছে, সে মজিয়াছে, বলিতে পারে না। সংসারে ঐ সকল দেবভাবা মানবীয় ভাষায় বিকৃত হইয়া গ্রন্থাকারে নানাভাবে শিক্ষা প্রদান করিতেছে, এজন্য তদ্দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির আশা বড় দুর্ব্বল। আপনি একটুকু ভাবিয়া দেখুন ত। যিনি আঙ্গুর ফল দেখিয়াছেন ও তাহার আস্বাদন ভোগ করিয়াছেন, তিনি কি পুস্তকের চিত্রিত ফলে তৃপ্ত হন? কোটি কোটি শাস্ত্র তাঁহার প্রাণে উদিত ও অস্তমিত হইয়া যায়। হা! ব্রহ্মজ্ঞান যে ভেদ-শূন্য স্বাভাবিক তত্ত্ব, সে কেন হিন্দু, ম্লেচ্ছ, যবন কারাগারে বদ্ধ থাকিবে?

বুঝিতে হইবে, এক মহা জ্ঞানই প্রাণীগণের হৃদয় ভেদ করিয়া আছে। মানুষ, অন্ধ বিশ্বাসের মূলে অবস্থিতি করে, সেই জন্য সর্ব্বগত চৈতন্য শক্তিকে ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। প্রত্যেক দেহীর ভিতরে একই নিত্য চৈতন্যের মহা লীলা হইতেছে, তাহাকে মানব স্বার্থ বুদ্ধির তীক্ষ্ণধারে ফেলিয়া পৃথক পৃথক বুঝিতেছে। দুর্দ্দমনীয় অহং প্রভাবে, অনন্তব্যাপী জ্ঞানকে এমনই সংকীর্ণরূপে প্রাণে স্থান দেয় যে তাহাতেই ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট জাতি ভাব প্রকাশ পাইয়া প্রমাদ ঘটাইতেছে। বিশুদ্ধ উদার ভ্রাতৃভাব মোহ কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইবে আশ্চর্য্য কি?

তবেই দেখুন, অখণ্ড চৈতন্য তত্ত্ব, জাতি বা কোন ব্যক্তি বিশেষে বদ্ধ নহে, ভ্রান্তির আচ্ছাদন ঘুচিয়া গেলে যদ্দ্বারা সকল

প্রকার প্রাণী মধ্যে ঐ স্বর্গীয় বিশুদ্ধ তত্ব অনুভূত হয়, উহাই স্বাভাবিক ব্রহ্মজ্ঞান। এই অব্যর্থ তত্ব জ্ঞানের আকর্ষণে মানবের দেবভাবে অধিকার জন্মে এবং প্রাণে ব্রহ্মচিন্তা অঙ্কুরিত হয়। ক্রমে ক্রমে ঐ নিরন্তর তত্বচিন্তা ঘনীভূত হইলে আর ব্রহ্মজ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারেনা, তখন মনে হয়, বিশ্বচরাচরে কেহইত পর নহে, সকলিত পিতার ভিতরে পুত্রভাবে একই ভাবে স্থিতি করিতেছে। বৃক্ষ বল্লী ভূচর খেচরাদিতেও গূঢ় প্রবিষ্ট অনন্ত মহান শক্তি বর্ত্তমান। মায়িক চক্ষুর বহির্বিচিত্রতার স্থূলদৃষ্টি অপগত হইলে চিন্ময় ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন আর কিছু থাকে না, জ্যোতিশ্চক্ষুর উজ্জ্বল দৃষ্টিতে পরিমিত জ্ঞান সকল চলিয়া যায়। লালজী ঠাকুরজী এক হইয়া যান, ভেদজ্ঞানের দুর্জ্জয় বল দুর্ব্বল হয়, ব্রহ্মশক্তির জ্বলন্ত জ্যোতিতে প্রাণ পূত হইলে, সাধু প্রবৃত্তি সমূহ হৃদয়কে অধিকার করে, তখন আর আপন পর, শত্রু মিত্র জ্ঞান থাকে না। সূর্য্যের প্রকাশে যেমন তমোরাশি বিলুপ্ত হয়, তেমনই তত্ব জ্যোতিতেও কোন প্রকার ভেদ কপটতার মলিনভাব থাকিতে পারে না।

মানবের প্রকৃতি ভেদে পৃথিবীতে কত প্রকার ধর্ম্ম মতের ব্যাখ্যা শুনা যায়। অনেকে বলেন, ব্রহ্মজ্ঞানত ব্রহ্মকে বোধ! একটী ধাতু বা শীলা যে কোন পদার্থই হউক না, তাহাকে ব্রহ্ম ভাবিলেইত ব্রহ্মজ্ঞান স্ফূর্ত্তি পাইল, তবে এটা ওটা সেটা এক করিবার প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মণ যবনাদি জাতি বিভিন্নতা ঘুচাইবার জন্যই বা এত বাড়াবাড়ি কেন? এক ব্রহ্মইত উদ্দেশ্য, গাছ পাথর যাহাকেই ভাবি না, ব্রহ্মজ্ঞান অবশ্যই হইবে। এইরূপ বিশ্বাসের স্থলে একটী কথা আছে, ঐ পুষ্করিণীর কাচকর

পরিষ্কৃত জলের অভ্যন্তরে একখণ্ড প্রস্তর আছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে সত্যই কি সরসীর সকল প্রদেশ দেখা যায়? কখনই নহে। আবার সরোবরটীর সমগ্র আয়তনের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে প্রস্তর খণ্ড অদৃশ্য হয়, তবে খণ্ড বস্তুতে অখণ্ড ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এইকারণেই যোগীগণ ব্রহ্মজ্ঞান মহাতত্বকে সকলের মধ্যে অমিয় প্রেমে দেখিয়া থাকেন। ইনি সাধু, উনি অসাধু, উটি বৃদ্ধ, এটি শিশু, এরূপ পৃথক জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী। বাস্তবিক, দেহের বিকার ও নির্ব্বিকার বশতঃ যে জ্ঞানের তারতম্য হয়, তাহা ভ্রান্তি; অন্তঃপ্রবেশিনী শক্তিত সমভাবেই স্থিতি করিতেছে? তবে দেখুন, আপনার পুত্রে ও প্রতিবেশীর পুত্রে একই পুত্রত্ব স্নেহ দৃষ্টি রাখিয়া যদি চিদানন্দ অনন্তজ্ঞান গ্রহণ করেন, তাহা হইলেত নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় সমভাব হইয়া গেল। এইজন্য জড়ভেদী অস্পর্শ শক্তির আলোকে ব্রহ্মজ্ঞান বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়। প্রকৃত পরমহংসের ভাবকি? পণ্ডিতে মূর্খে, দুঃখী ধনীতে অভিন্ন ভাবে মধুর মিলন। এক বিন্দু ভেদ থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ পায় না, সেই আশঙ্কায় যোগীগণ পৃথিবীর জ্ঞানকাণ্ড হইতে পৃথক; তাঁহারা পরিমিত শাস্ত্রজ্ঞানের যুক্তি-তর্কে কর্ণপাতও করেন না। তাঁহারা স্বাভাবিক "ব্রহ্মকূপাতেই" হৃদয় মন, প্রাণ একবারে ডুবাইয়া অনন্ত প্রেমে সুখী হন।

এখন দেখা যাক, অভ্রান্ত শাস্ত্র ও স্বাভাবিক জ্ঞান এতদুভয় মধ্যে কোনটি সহজ ও প্রকৃত। প্রথমতঃ দেখা উচিত, অভ্রান্ত শাস্ত্রজ্ঞানের ফল কি? মানব, চারিবেদ, চৌদ্দশাস্ত্র, অষ্টাদশ পুরাণ, উপপুরাণ পাঠ করিয়াও তত্বজ্ঞানী হইতে পারে না, পরি-

শেষে শিশুর সরল অবস্থায় পঁহুছিলেই ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে। অন্নেই বুঝুন, প্রথমেও শিশু, পরেও শিশু, মধ্যে কেবল মারামারি কাটাকাটি। মহাযোগী খ্রীষ্ট কি বলিয়াছিলেন ? ঐ শিশুই স্বর্গের অধিকারী, "তাহাকে আসিতে দাও" এস্থলে প্রমাণ হইতেছে যে সরলতাই ব্রহ্মজ্ঞানের পরিষ্কৃত পথ। শাস্ত্র জ্ঞানে তাহা লাভ করা সহজ বলিয়া বোধ হয় না। শাস্ত্রের শিরো-ভূষণ "ষড়দর্শন" সম্বন্ধে সাধক-শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, ষড়্দর্শনের অন্ধগুলা বেদে দিলে "চক্ষেধূলা"। চার্কাকাদি দর্শন-শাস্ত্রের কূটজাল বিস্তৃত রহিয়াছে, অধিক চিন্তা করিতে গেলে "নাসৌমুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্'' এরূপ ঘোরতর মত-বৈষম্যে পড়িতে হয়। হা ! যখন পণ্ডিত হইয়াও শাস্ত্র জ্ঞান ভুলিতে হয় তখন আর না।

এখন স্বাভাবিক জ্ঞানের কিছু দেখা আবশ্যক। শিশু যখন মাতৃ গর্ভে একমাত্র অমৃত নাড়ীর রসে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন কি তাহার মধ্যে চৈতন্য শক্তি প্রমাণ হয় না ? একথা কে বলিবে ? সে যে নিত্য চৈতন্য যোগী। শিশু ঐ স্বাভাবিক চৈতন্য শক্তিতে জড়িত হইয়া ভূমিষ্ট হয়, তাহাতে যে এক সরলতাই আছে, এমন নহে, যোগশক্তিও বিদ্যমান রহিয়াছে। ভয় চিন্তা, দুঃখ শোক প্রভৃতির অতীত—আপনা হইতেই স্তন পান করিতে, উঠিতে, বসিতে, হাসিতে কাঁদিতে জ্ঞান পায় এবং ওঁ মা শব্দে কথা বলিয়া উঠে। অবিশ্বাসী মানব, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই স্বার্থপূর্ণ কুটিল শিক্ষা দ্বারা স্বাভাবিক জ্ঞানকে ভুলাইয়া দেয়, বিশুদ্ধ শিশুর সরলতা আর থাকিতে পারে না। যাহাহউক, ইহার ভিতরেও অজস্র নিত্য জ্ঞান বর্ষিত হইতেছে, যাঁহারা

উপেক্ষা করেন না, তাঁহারা ধন্য। নির্ভরশীল যোগী ভিন্ন স্বর্গের তত্ত্ব পৃথিবীতে কে আনিবে? তাঁহারা ভিন্ন সেই দেবভাষা আর কে বুঝিবে? পরপিণ্ড-প্রত্যাশী তর্কনিষ্ঠ পণ্ডিতগণই স্বাভাবিক ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে আপত্তি করেন। আপনি বলুন্ ত, ঐ যুবকটী মেরুদণ্ডের উপরে বিস্ফোটকের অসহ্য যাতনায় আঃ হুঃ উঃ শব্দে যে ছটফট করিতেছে, ইহা কি কোন ডাক্তার বাবু বুঝাইয়া দেন, না আপনা হইতে বুঝে? আরও একটী কথা বলি, শ্রুতিবিদ্‌গণই কেন বলুন না, সকলের আদিতে অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তিটিকে কি কোন টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয় জ্ঞান দিয়াছিলেন?

এখন বুঝুন্, স্বার্থকলুষিত শাস্ত্রজ্ঞান স্বাভাবিক জ্ঞানের নিকট পরাভূত হইতেছে কি না? এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, অপ্রভেদ সাম্য দৃষ্টিতেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ পায়। ইহাতে দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থসঙ্কুল সংসারেও স্বর্গের ন্যায় শ্রী ধারণ করে। কিন্তু মানবীয় মোহবশতঃ ইহাকে প্রাণে প্রত্যক্ষ করা সহজ নহে, ইহা স্বাভাবিক ব্রহ্মকৃপা-সাপেক্ষ। জগতে বিজ্ঞান রসায়ন ভূতত্ত্ব প্রভৃতির যে সমস্ত উন্নতি দেখিতেছি, তাহা স্বাভাবিক মহাজ্ঞানের আভাস মাত্র, সূর্য্যের কিরণ ধরিয়া যেমন সূর্য্যমণ্ডলে যাওয়া যায় না, তেমনই আভাস জ্ঞানেও ব্রহ্মজ্ঞানের আলো গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। মণিকরের বিপণিতে প্রকৃত স্বর্ণের এবং কৃত্রিম (গিল্‌টি) অলঙ্কার সকল সজ্জিত থাকে, অধিকাংশ লোকেই ঐ আভাস স্বর্ণ জ্যোতিতেই মুগ্ধ হন, ঠকিয়াও যান। বিপুল বিদ্যা বুদ্ধি-সম্পন্ন জ্ঞানীদিগের মধ্যেও ঐরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখা যায়। কারণ এখনও অনেকে

চন্দন ঘসিতে ও বিল্ব তুলসীদল তুলিতে ত্রুটি করেন না, কাজেই ভ্রূ ঊর্দ্ধে টানিয়া তর্ক করিতে ছাড়িবেন কেন ?

যাক্ এখানে অন্ধজ্ঞানের কথা নিষ্প্রয়োজন। ব্রহ্মজ্ঞান মহাতত্ত্বের বিষয় যতটুকু বুঝিতে পারা যায়, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, জ্ঞানীগণ দুই ভাগে বিভক্ত, এক শ্রেণী শাস্ত্রজ্ঞ, অপর শ্রেণী স্বাভাবিক জ্ঞানযুক্ত; অর্থাৎ পণ্ডিত আর যোগী শ্রেণী। সঙ্গীতে শুনিয়াছি "পণ্ডিত মরেন কেবল ঝগড়া করে", বাস্তবিক এটি সাধক বা যোগীর কথা—যোগী ভিন্ন বেদ বেদান্তবিৎ পণ্ডিতগণ কেহই এই মহাতত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম নহেন। অক্ষর-বর্জ্জিত ধর্ম্মপরায়ণ একজন যোগী শিরোমণি মহাশয়কেও নিরস্ত করিয়া ফেলেন। খ্রীষ্টের হৃদয় হইতে যে সময় গভীর তত্ত্বজ্ঞানের কথা বাহির হইয়াছিল, সে সময় কি পণ্ডিতেরা ঐ সকল দেববাক্য বুঝিয়াছিলেন ? বুঝিলে ত ক্রুশের ব্যবস্থা হইত না ! ইহাতে জানা যাইতেছে, নিরক্ষর সরল হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে, এ কথায় সংশয় নাই।

হয়ত অনেকে এই গূঢ়তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করিয়া বলিতে পারেন, কি ! প্রৌঢ়কাল হইতে অশীতিবর্ষ বয়ক্রম পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিলেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না, ঐ চোক বুজিয়া পাথরের পুতুলের মত থাকিলেই ব্রহ্মজ্ঞানী হয় ? আবার সদ্যপ্রসূত শিশুটিও যোগী হইল ; এ সকল কি পাগলের কথা নহে ? তাই বলিতেছি, বিদ্যাই বিড়ম্বনা, ভিতরে একটুকু প্রবেশ করিয়া অনায়াসে বুঝা যায়, মহাশক্তি ও জীবশক্তি একই নিরাকার তত্ত্ব ! ব্রহ্মই, ব্রহ্ম মহাভাব জীবভাবে অখণ্ডরূপে লীলা করিতেছেন। যোগীগণ প্রজ্ঞাচক্ষু প্রভাবে শত শত মালার ছিদ্রপ্রবিষ্ট সূত্রের ন্যায় জীব

জড়িত ব্রহ্মশক্তিকে একই ভাবে প্রত্যক্ষ করেন। কি উদার মহদ্দৃষ্টি! ইহাকেই ত ব্রহ্মজ্ঞান বলে। নিরাকার চিচ্ছক্তি ও জীবশক্তি কি কখন বাল্য যুবা বৃদ্ধাবস্থায় আকৃষ্ট হয়? বাহিরে স্থূল দৃষ্টিতে যে অজ্ঞান প্রবল হইয়া স্বাভাবিক সরল জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে? ঐ বৃদ্ধ বিদ্যানিধি মহাশয় কি বিশুদ্ধ বিশ্বজনীন প্রেমে ক্ষতশরীর রোগাক্রান্ত যবন ভাইটীকে আলিঙ্গন করিতে পারেন? কখনই না; অথচ গলিতকুষ্ঠ রোগাক্রান্ত রোগী, বিদ্যানিধির শিশু পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইবার জন্ম হাত বাড়াইলে, অমনি ছেলেটি ক্ষত শরীরে বুক দিয়া স্বর্গীয়প্রেমে গোফ টানিতে থাকে এবং কতই যে আনন্দ প্রকাশ করে, বলিতে পারা যায় না। আহা! শিশুর সরলতা কি মধুর! বাহিরের মোহ-ভাবের আতিশয্য বশতঃ এমন যে পবিত্র ভাব, ইহা কেহ গ্রহণ করেন না, বরং ব্যঙ্গচ্ছলে উড়াইয়া দেন। বাস্তবিক যে পর্য্যন্ত শিশুভাব প্রাণে ফুটিয়া না উঠে, সে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান বুঝিবার শক্তি হয় না, ভয়ানক তর্ক যুক্তি ও জাত্যভিমান প্রভৃতির ভীষণ সংগ্রামে আত্মাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলে। হিংসা-দ্বেষ ও আত্ম-ম্ভরিতার আক্রমণে অসাড় হইতে হয়, কিরূপে স্বাভাবিক ব্রহ্ম-জ্ঞান স্ফূর্ত্তি পাইবে?

তবে কি স্বাভাবিক ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না? একথা কে বলিল? স্বাভাবিক অর্থটা কি? আপনার ভাবে যিনি আপনি—তিনি কে? তিনি ব্রহ্ম। মানুষের কি কোন হাত আছে? তিনি হাত না উঠাইয়া দিলে একমুষ্টি অন্ন গ্রহণ করিতে কে পারে? মানুষ কানুনটা কার বলে চলিতেছে, শ্বাস প্রশ্বাসের কল কে চালাইতেছেন? যোগী পরিশেষে অবাক্ হইয়া বলিলেন,

"ব্রহ্মকৃপাহিকেবলং", ব্রহ্ম কৃপাতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। ঈশ্বরে নির্ভরই একমাত্র স্বাভাবিক ব্রহ্মজ্ঞানের পথ। যাঁহারা স্বার্থশাস্ত্রের কুটিল চিন্তা ও জাতি-শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার একবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন,তাঁহারাই সেই স্বর্গীয় তত্ত্ব প্রাণে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

সাধক যত কেন অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া বা অপূর্ণ মানবশক্তির উপর নির্ভর করুন না, কিছুতেই মহাজ্ঞানের তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন না। তন্ত্রাদি শাস্ত্রে চিত্ত নিরোধাদির যে সকল ব্যবস্থা শুনা যায়, তাহা সকলই জড় বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত। প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুকোষে অথবা নাসিকাগ্রদর্শন প্রভৃতিতে চিত্ত স্থিরের উপায় অবলম্বন করিলে কি হয়? তাহাতে ব্রহ্মের সহিত সম্পর্ক কি? পূরক স্তম্ভনে ও নাসিকার অগ্রভাগে ত ঈশ্বর থাকেন না? আবার সে সকল বাতিল নামঞ্জুর হইয়া স্বাভাবিক ভাবই ত দাঁড়ায়? এই নিমিত্ত বলিতেছি ঐ সমস্ত সাধন ঐন্দ্রজালিক পণ্ডশ্রম মাত্র। একমাত্র ব্রহ্মই লক্ষ্য, এই ত স্বাভাবিক পথ। এই পথে মধ্যবর্ত্তী কাহারও সাহায্য লইতে হয় না, ব্রহ্মই পথ-প্রদর্শক। তাঁহার কৃপা বিকাশের অবস্থাকে স্বাভাবিক বলে। ইহা কেমন সহজ ও সুন্দর। ঈশ্বরে লক্ষ্য স্থির হইলে স্পর্শ যোগশক্তির অব্যর্থ আকর্ষণে ব্রহ্মজ্ঞান আপনা হইতে প্রাণকে আকৃষ্ট করিয়া লয়। তখন আর কোন প্রকার ভেদভাব থাকে না, সকলই মধুময় হয়; যোগী অনন্ত প্রেমে মজিয়া যান।

জ্ঞান ভক্তির মিলন।

জ্ঞানের সাধ্বী স্ত্রী ভক্তি। ভক্তি অপ্রিয় ব্যক্তির সেবাতেও অনুরক্তা এবং নিম্নগামিনী, এজন্য রৌদ্র ভাবাপন্ন স্বামী সন্নিধানে অনাদৃতা, আবার জ্ঞানও প্রখর সোঽহং তত্ত্বের কঠোরতায় ভক্তির মধুর ভাবে উদাসীন। অরণ্যের তীব্র বৈরাগ্যে চিন্তা শক্তির পরিণতি "ব্রহ্মাহং"আমি ব্রহ্ম। কেইবা কাহাকে পূজা প্রার্থনা করে, কাহাকেই বা কে সংহার করিতে পারে, সকলি'ত আমি। আমি ভোগ্য, আমি ভোক্তা, ইত্যাদি যুক্তি বিচারের গভীর চিৎকারে পৃথিবী কাঁপিতেছে। শঙ্কর প্রভৃতির সময়েও ঐ শুষ্ক জ্ঞানের অগ্নিকাণ্ডে ভক্তি মৃতবৎ অবস্থিতি করিতেছিল। বলিতে কি, অদ্বৈতবাদের সম্মুখে ভক্তির সাধ্যও ছিল না যে উপস্থিত হয়। আবার মহাভক্ত চৈতন্যের আবির্ভাবে সেই প্রচণ্ড জ্ঞানাগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গেল, তখন ভক্তির শক্তি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এমন কি, দন্তে তৃণ, রসনাগ্রে ব্রজরজ, ললাটে প্রণত চিহ্ন দীনতার ইয়ত্তা রহিল না। ভক্তগণ হরিনাম কীর্ত্তনে অহোরাত্র চব্বিশ প্রহর ডুবিয়া থাকেন, এজন্য জ্ঞান অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ভক্তির করুণ বিলাপে এমন কে পাষণ্ড আছে যে অশ্রু সংবরণ করিতে পারে? জ্ঞান-বিরহিনী উন্মাদিনী ভক্তির অধিকারে, পায়ের ধূলাই বা থাকিবে কেন?

বাস্তবিক, "জীবে ভক্তি নামে রুচি" এটি বড় মধুর তত্ত্ব। ইহা ভক্তের রক্তের সহিত মিশিলে ভাবাবেশে প্রতি লোম-

কূপে রক্ত বিন্দু মুক্তাকলাপের ন্যায় প্রকাশ পায়।* পাইলেই বা কি হয়, সে যে জ্ঞান-বিরোধিনী প্রথমা ভক্তির উচ্ছ্বাস ভাব। স্বেদ, কম্পন, রোমাঞ্চ, বৈবর্ণ্য, মত্ততা,হুঙ্কারাদির জীবন্ত আবেশ সত্বেও প্রকৃত তৃপ্তি হয় না, কারণ, সচ্চিদানন্দ রসমাধুর্য্য ভোগ জ্ঞান ব্যতীত কে করিবে? চৈতন্য শূন্য হইলে যে মোহ-আচ্ছাদনে প্রচ্ছন্ন থাকিতে হয়, মূর্চ্ছা আসিয়া প্রমাদ উপস্থিত করে, সকল আশা ভরসা তিরোহিত হইয়া যায়। আবার ইহাও সত্য যে, ভক্তি ভিন্ন হিংসা দ্বেষ অহঙ্কার প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি সমূহ নিরস্ত হয় না। বৈরাগ্য, ধৃতি, ক্ষমা এবং দীনতা, সহিষ্ণুতা, ব্যাকুলতা ইহারাও ত ঐ ভক্তির আশ্রিত। জ্ঞানের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেও বৈদিকাদি কর্ম্ম-নিবন্ধন ভক্তির নির্ম্মলা শক্তি ম্লান হইয়া যায়। গোমেধ, অশ্বমেধ, নরমেধ যজ্ঞাদির বিধানে কি ভক্তি বাঁচিতে পারে? উপনয়ন সংস্কারে ব্রাহ্মণ ও চিহ্ন-বর্জ্জিত শূদ্র এই শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট জাতিভেদের অধিকার যাতনা, কেমন করিয়া সহ্য হয়। ভক্তি জ্ঞান বিরোধিনী হইয়া ব্রহ্ম রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিলেও স্বর্গীয় সেবার ভাব ছাড়িতে পারে না। এইজন্য ভক্ত, জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডকে বিষবৎ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভক্তি স্বভাবতঃই সরলভাব সম্পন্না, জাতি নির্ব্বিশেষে সেবার জন্য কাঙ্গালিনী। সংসারের পরিত্যাজ্য রোগাক্রান্ত শ্বপচ ভগিনীটির মুখচুম্বন করিয়াও যেরূপ তৃপ্তি, ঐ অট্টালিকার স্বর্ণ জড়িতাঙ্গিনী রাজকন্যার প্রতিও সেইরূপ। ভক্তির উদার

* শুনিতে পাওয়া যায়, একদিন কাশিতে চৈতন্যের ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল।

প্রকৃতি মধ্যে বিন্দু মাত্র ভেদ-কলঙ্ক প্রবিষ্ট হইতে পারে না, বরং তৎসংস্পর্শে পবিত্র হইয়া যায়। কেনই বা যাইবে না, ভক্তির যে অকৃত্রিম ভালবাসাই অন্ন, অবিচ্ছিন্ন স্বর্গীয় ভাবাশ্রুই জল, অভিন্ন সেবা রসামৃতই ভোগ। এমন নিষ্ঠুর কে আছে যে, এই সমদর্শিনী সেবা কাঙ্গালিনীর নির্ম্মল চরিত্রে আকৃষ্ট হইবে না? আহা! ভক্তগণ কি সহজে উন্মত্ত হন? যখন বিশ্বজনীন ভালবাসা প্রাণকে তোলপাড় করিয়া ফেলে, তখন কি কেহ জ্ঞানের গরিমায় শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট ভাবে বদ্ধ থাকিতে পারেন? কিঙ্কুলুকের ন্যায় নিরীহ ও পদদলিত তৃণ তুল্য ভাবে অবস্থিতি করেন। 'হ' অক্ষর উচ্চারণ হইতে না হইতে অশ্রু জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়, ভাবের আবর্ত্তে রোদন সংবরণ করিতে পারেন না, 'রি' বলিবার আর সময় কৈ; অমনি মূর্চ্ছা। আঃ—উন্মাদিনী ভক্তির ভাবের কি জলন্ত উচ্ছ্বাস! পর্ব্বত সদৃশ ধীর ব্যক্তিও হৃদয়ভেদী ক্রন্দন বেগ সংযত করিতে পারেন না, ভাবাবেশে মজিয়া যান। ভক্তের ত কথাই নাই, তিনি পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বুঝেন না, সকলের নিকট অবনত, সেবার ভিখারী। নিষাদ শরাহত কুকুরটির ক্ষতস্থানে ঔষধি লেপন ও আহার প্রদান না করিয়া বাঁচেন না, সর্ব্বদা তাহার জন্য ব্যতিব্যস্ত, আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাণে শান্তি নাই, কতই যে কষ্ট, কে বুঝিবে?

এখন দেখা আবশ্যক, প্রকৃত জ্ঞান কি? বস্তুতঃ জ্ঞানের মৌলিক তত্ত্ব চেতন শক্তি, যোগিরা ইহাকে স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। স্মৃতি, বুদ্ধি, বাক্য, মন, দর্শন, শ্রবণ এ সকল ঐ শক্তিরই বিকাশ। ইহারাও শম, দম, তিতিক্ষা ও বেষ, মন্ত্র,

হিংসা প্রভৃতি শুভাশুভ উভয় বৃত্তি মধ্যে বিচরণ করে। জ্ঞান-স্বরূপ বিধাতা সকল প্রকার জন্তুকেই স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহারা সেই স্বাধীন শক্তি বলে সুখ, দুঃখ শান্তি অশান্তি ভোগ করিতেছে। পশুপক্ষীর মধ্যে সীমাবদ্ধ জ্ঞানের বিধানেও কোন যন্ত্রণার কারণ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু উন্নত জ্ঞান বিশিষ্ট মানবগণ, স্বাধীন শক্তির স্বার্থ প্রলোভনে পড়িয়া জ্ঞানকে নানা ভাবে গ্রহণ করেন। মানবের চিন্তাশক্তি সকল অপেক্ষা উন্নত, এজন্ত কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না, একবারে উড়াইয়া দেন, কেহ নিজেই ঈশ্বর হইয়া বসেন, কেহ গাছ পাথর ও নরপূজা করিতেও ছাড়েন না। বুঝিতে হইবে, এই যে জ্ঞান-বিভ্রাট, ইহার দুইটী কারণ আছে। একটী অভ্রান্ত শাস্ত্র-বিশ্বাস, আর একটী রুচিগত স্বার্থ-চিন্তা। এই দুটী অনুদার ভাব দ্বারা সরল প্রকৃতিকেও সন্দেহের তরঙ্গাঘাতে আকুল করিয়া ফেলে। নদী যেমন বাধা প্রাপ্ত হইলে বহুদিকে প্রবাহিতা হয়, তেমনই তেজস্বী মনস্বীরাও স্বার্থ চিন্তার উত্তেজনায় বিবিধ প্রকার যুক্তি পথে ছুটিতে থাকেন। অনাবৃত সরল তত্ত্বের প্রতি তাঁহাদের আদবেই দৃষ্টি পড়ে না, তর্ক যুক্তির ভয়ঙ্কর সংগ্রামে চিত্তকে উত্তেজিত করিতে থাকেন, কিরূপে তত্ত্ব জ্ঞানের বিশুদ্ধ মাহাত্ম্য বুঝিবেন? পাণ্ডিত্যের হুঙ্কারে উদার তত্ত্ব সমূহ কোথায় যে লুক্কায়িত থাকে, অন্বেষণ করে কে? তবেই বলিতে পারা যায়, ঐ অগ্নিকল্প তর্ক যুক্তি, তত্ত্ব জ্ঞানকে প্রকাশ হইতে দেয় না, কেমন করিয়া সেই উদার তত্ত্ব আসিবে? এই জন্তই কি চৈতন্ত বলিয়াছিলেন, "হায়! জ্ঞান আমাকে শান্তি দেয় না"। যথার্থই শুষ্ক জ্ঞান যে অশান্তির হেতু, তাহা সাধক ও ভক্ত মাত্রই স্বীকার করিবেন।

অভ্রান্ত শাস্ত্রবিশ্বাস ও রুচিগত স্বার্থ-চিন্তা চলিয়া গেলে, তত্ত্বজ্ঞান অঙ্কুরিত হয় এবং দয়া, দাক্ষিণ্য ঔদার্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল সঙ্গীরূপে অবস্থিতি করিয়া ক্রমে ক্রমে সাধুভাবে চিত্তকে অধিকার করে। আশ্রয়-অনাসক্ত বৈরাগ্য,ত্যাগীর সহিত আলিঙ্গনে নীরস বা কঠোর না হইয়া, বরং তাহাতে শান্তির পবিত্র আশ্রয়ে আরাম দেয়। তখনই অনাবৃত তত্ত্ব জ্ঞানের সম্যক জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, শুষ্কভাব বা কোন প্রকার তর্ক চিন্তা থাকিতে পারে না, অভেদময় জীবত্বের মধুর তত্ত্ব-প্রেম উজ্জলরূপে প্রকাশ পায়। দীনতা, শিষ্টতা, সাধুতা এ সকলও আর প্রচ্ছন্ন থাকে না, সাম্যভাবে জগৎকে আলিঙ্গন করে। প্রেমের বিশুদ্ধ সংস্পর্শে জাত্যভিমান ও বিদ্যার উচ্চ সম্মান ঘুচিয়া যায়, * আপনাকে নিতান্ত জঘন্য বলিয়া বোধ হয়, সকলের নিকট নীচ না হইয়া থাকিতে পারা যায় না।

ওদিকে যেমন তত্ত্বজ্ঞান হইতে প্রেমের প্রকাশ দেখিলেন, আবার এদিকেও তেমনই দেখুন, অখণ্ড জীবভাবে ভালবাসার পরিণতি ভক্তি—ভক্তির ঘনতাই প্রেম। তবেই বুঝুন, প্রেম, জ্ঞান ভক্তি উভয়েরই প্রিয়। প্রেমের পবিত্র সহবাস কেহই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে। প্রেম যেন তুলাযন্ত্রের কাঁটার ন্যায় ঠিক মধ্যস্থলে থাকিয়া উভয়কে সমভাবে রক্ষা করিতেছে। জ্ঞান ভক্তিও প্রেমের প্রণয় পাশে বদ্ধ হইয়া উচ্চ নীচ ভাব

* বৃন্দাবনে মহা পণ্ডিত রূপ গোস্বামী, দিগ্বিজয়ীর সহিত বিচার না করিয়াই পরাজয় স্বীকার করেন এবং জয়পত্র লিখিয়া দেন। কারণ, তখন তিনি প্রেমের সংস্পর্শে পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া জগতের নীচ হইয়াছিলেন।

প্রদর্শন করিতে সক্ষম নহে, অগত্যা তাহাদের সাধ্যভাব ব্যতীত আর উপায় কি?

এই ত মিলনের অবস্থা, কিন্তু সংসার তাহা গ্রহণ করে না। স্বার্থাকৃষ্টমনা পণ্ডিতেরাই জ্ঞান, প্রেম, ভক্তিকে অযথা ব্যবহার দ্বারা মহা অনিষ্ট সংঘটন করিতে বাধ্য হন। তত্ত্বজ্ঞানকে শুষ্কতায় আনিতেছেন, দেবদত্ত প্রেমকে মত্ততা-প্রমত্ত ভাবে দেখিতেছেন, অপ্রভেদ ভক্তিকেও প্রখরা বা উন্মাদিনী করিয়া তুলিতেছেন। এমন যে মধুর মিলন ভাব, তাহাতে এতই অপ্রিয় অপ্রীতি অসূয়া ঘটাইয়া দিতেছেন যে, কেহ তাহাকে স্পর্শ করিতেও চায় না। যে স্থানে জ্ঞানের আধিপত্য, সে স্থানে কি ভক্তি আসিতে পারে? তখনি যে দ্বীপান্তর ব্যবস্থা! প্রেম কখন কখন বর্ত্তমান সময়ের জ্ঞানীদলে বা উপাসক মণ্ডলীতে দেখা দেয় বটে, কিন্তু সেখানে ইহা অকৃত্রিম প্রাণগত সরল ভাবে সমাদৃত নহে। অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, উপাসক মহাশয় প্রেমের অনন্ত উপদেশ দিয়া সকলকে হুহু শব্দে কাঁদাইলেন,আসন পরিত্যাগ করিলে আর কোন কথাই নাই। ঐ যে রাজপথের এক পার্শ্বে দুঃখিনী অন্ধ মাতাটী উদরান্নের জন্য চীৎকার করিতেছে, তাহার দিকে কে তাকায়? অথচ উপাসনা মন্দির চক্ষের জলে ভাসিয়া যায়।

এইরূপ অন্তর্বহির্ভাবের ভিন্নতা সত্ত্বে কি কখন তত্ত্বচিন্তার অধিকার জন্মে? বরং সম্মানপিপাসা ও মানবীয় আদর্শ-লিপ্সা প্রবল হইয়া মতের বৈষম্য চিন্তা শক্তিকে আরও উদ্দীপ্ত করে, এবং সরল ও উদার তত্ত্বে বঞ্চিত হইতে হয়। শর্করাভারবাহী বলীবর্দ্দ যেমন শর্করার আস্বাদন জানে না,মানলিপ্সু শুষ্ক জ্ঞানীও তেমনই

এই তিনটী নাড়ী সাম্যের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ বাতে পিত্ত মিশিলে বিষম জ্বর এবং পাণ্ডু রোগাদি উপস্থিত হইয়া শক্তি ক্ষীণ করে, আবার বাতে শ্লেষ্মা মিশিলে উভয়ের অসাম্য ভাব-জনিত বিকার ভাবে মৃত্যু ঘটে, তেমনই শুষ্ক জ্ঞানে প্রেম ভক্তির মিলনেও ভয়ানক যন্ত্রণায় পড়িতে হয়। কারণ, শুষ্ক জ্ঞানের শক্তি সহসা উচ্চতার দিকে লইয়া তর্কচূড়ামণি মহা পণ্ডিত করিয়া তুলে। কিন্তু প্রেম জগৎকে সমভাবে ভালবাসা দেয়। ভক্তি নীচভাবে সকলকে সেবা করিতে বাধ্য। এই জন্যই শুষ্ক জ্ঞানী পণ্ডিতেরা প্রাণীবধ ব্যাপারেও কুণ্ঠিত হন না। তাঁহাদের সূক্ষ্ম মীমাংসার তীক্ষ্ণধারে ঈশ্বরের অস্তিত্বই টেঁকে না, তাহাতে আবার প্রেম ভক্তির কথা! যাহা হউক, প্রকৃত জ্ঞান ও প্রেম ভক্তির সম্মিলন না হওয়াতেই পৃথিবী সন্তপ্ত হইতেছে, সন্দেহ কি? আবার ইহাও বলি, প্রেম ভক্তির প্রভেদ ভাবেও মহা অনিষ্ট ঘটে।

এস্থলে একটী রহস্য মনে পড়িল। এখনকার একজন ভক্তি প্রবলনাড়ী বৈষ্ণব বিষ্ণুপুর যাইতেছেন। ঐ বৈষ্ণব ভক্তটী বিষ্ণুপুরের মৃত্তিকা স্পর্শ মাত্র অধৈর্য্য হইলেন এবং অশ্রুপাতপূর্ব্বক প্রণাম করিতে লাগিলেন। কারণ, সেই গ্রামে কীর্ত্তনের বাদ্যযন্ত্র মৃদঙ্গ প্রস্তুত হয়। সত্যই ভক্ত সরল ভাবে ভক্তির আবেশে প্রণাম ও অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানে বুঝাইয়া দিল মৃদঙ্গ হইয়াছে বলিয়া ক্রন্দন করিবার প্রয়োজন কি? প্রভুর নামেই মত্ত হইতে হইবে। ঝাড়ি খণ্ডের পথে চৈতন্য একবার বৃন্দাবন গমন করেন, অবধূত ভক্ত আর ঐ পথে চলিবেন না। তত্ত্বজ্ঞান মীমাংসা করিয়া দিল, চৈতন্য প্রায় সার্দ্ধ চারি শত বৎসর হইল ঐ পথে

গিয়াছেন, এখন দোষ কি? তুমি যদি সঙ্গে থাকিতে তবে কি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে না? তবেই বলিতে হয় জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি সকলেরই সাম্যভাবে পরস্পরের মিলন চাই। স্বাধীন শক্তির শুষ্ক জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া যদি তত্ত্বজ্ঞানে সমুদায় তত্ত্বের মিলন হয়, তাহা হইলে কখনই বিপদ ঘটে না।

হে তত্ত্বজ্ঞগণ! মানুষের তত্ত্বজ্ঞান না হইলে, নিত্য শক্তির অধিকার জন্মে না। বিশুদ্ধ জ্ঞান, পবিত্র প্রেম, অপ্রভেদ ভক্তির সাধন হইলে তত্ত্ব জ্ঞানের বিকাশ পায়, এবং জগৎ নির্ম্মলানন্দ ভোগ করে। নতুবা শুষ্ক জ্ঞান, বিচ্ছিন্ন প্রেম, ভেদ ভক্তির সাধনে উপরোক্ত হিংসাপূর্ণ হোম-যজ্ঞাদির বিধান ও অসার ক্রিয়া পদ্ধতির ব্যাপারকে প্রবল করিতে থাকে, তত্ত্বজ্ঞান ও প্রেম ভক্তির শক্তি ক্ষীণ হইয়া ভেদভাবে পরিণত হয়, বস্তুতঃ তাহাতেই ভ্রাতৃত্বতত্ত্ব বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

মানুষ অপূর্ণ; পরিমিত শাস্ত্র জ্ঞান বলে যতই মস্তিষ্ককে সূক্ষ্মের দিকে লইয়া যায়, ততই ব্রহ্ম জ্ঞানের ভাবকে ম্লান করিতে থাকে। এমন কি জীব শক্তিও উড়িয়া যায়—একরূপ নাস্তিক ভাব আইসে। ইহাতেই প্রকৃত তত্ত্বকে প্রচ্ছন্ন করিতেছে। হা! এই কি কথন সম্ভবে? জীবত্ব ধ্বংস সোঽহং তত্ত্বের নীরস ভাব—ইহা কি ব্রহ্ম জ্ঞানের কথা? অনন্ত মহা শক্তি হইতেই যে জীব শক্তির প্রকাশ, প্রেমভক্তিও সেই শক্তির ভিতরে বিহার করে, ইহাই ত সাধকের ব্রহ্মভাবের মধুর ভাব। জীবে ব্রহ্মে নিত্য ভাবের মধুরতা জীব ভাবেই ভোগ করিয়া থাকে। উদার মধুর ব্রহ্ম জ্ঞানেই শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট উচ্চ নীচ ভাবকে সমভাব করিয়া দেয়। এদিকে ভক্তিও ধনী,

দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, ব্রাহ্মণ যবনাদি প্রভেদ ভাব কিছুমাত্র মানে না। তবেই স্পষ্ট এখানে বলা যায়, জ্ঞান ভক্তির উচ্চ নীচ গতি সমান হইয়া কেমন মিলন হইল? প্রেমের ত স্বভাবতঃই সাম্যভাব, সুতরাং জ্ঞান, প্রেম, ভক্তির একত্র মিলন ভাবে আর কোন আপত্তি থাকিল না। এ ভাবেও যেন তিনটী নাড়ী সমান হইয়া গেল।

এই পবিত্র তত্ত্ব সমূহের সম্মিলনেই জগৎ নির্ম্মল জ্যোতিঃ ধারণ করে। তখনই ইহা অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় ভাবে সমস্ত প্রাণীকে এক মহা প্রাণের অসীম সত্তায় প্রত্যক্ষ করিতে পারে এবং স্বাভাবিক ব্রহ্মজ্ঞানের আলো দেখিয়া কৃতার্থ হয়। সংসার অরণ্য, নির্জ্জন সজন তুল্যভাবে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে এবং বহু পরিবার মধ্যেও উদাসীন অথচ যুক্ত যোগী হইয়া অভীষ্ট সাধনে বঞ্চিত হইতে হয় না। আশ্রম অনাসক্ত অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র ধনৈশ্বর্য্য মায়ার বস্তুতে পাত্রে পারদবৎ অবস্থিতি করিতে পারিলে, উহাকেই ত্যাগ বা সন্ন্যাস বলে, তবে সংসারেই বা কেন বৈরাগ্য সাধন হইবে না? যিনি প্রত্যেক পরিবারকে নিজের ভাবিয়া সেবা করিতে সক্ষম হন তিনিই তত্ত্বজ্ঞানী, প্রেমিক ভক্ত, বৈরাগী বা সন্ন্যাসী। যাহা হউক, এ বিষয় এখানে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। জ্ঞান ভক্তির বিবাহ ভঞ্জন ও উভয়ের মিলনই উদ্দেশ্য। জ্ঞানীর ভিতরে ভক্তি, ভক্তের ভিতরে জ্ঞান, সমবেত না হইলে ভয়ানক বিপদ ঘটে। কারণ, শুষ্কজ্ঞান ও উন্মাদিনী ভক্তি উভয়ই বিড়ম্বনা। যোগী, ভক্ত, সাধক সকলেরই এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রার্থনীয়।

গৃহস্থাশ্রমে সন্ন্যাস।

"পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ", ক্ষত্রিয়েরা পঞ্চাশ বৎসর রাজ্য ভোগের পর বানপ্রস্থ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন অর্থাৎ গার্হস্থ ধর্ম্ম শেষ করিয়া অরণ্য ব্রত পালনে অনুরক্ত হইতেন। এখন ত্রিংশৎ বর্ষ উর্দ্ধে বার্দ্ধক্যে পরিণত বা শরীর ত্যাগ করিতেও দেখা যায়, সময় কোথায় যে ঋষিবাক্য পালন হইবে? কিন্তু এরূপ ধর্ম্ম বিধানকে অবস্থোচিত অনুকূল বলা যাইতে পারে না। সংসার আর অরণ্য, স্বজন আর নির্জ্জন, গৃহী আর উদাসীন এ সকলের ভাব পৃথক্ পৃথক ভোগ করিতে হইলে পার্থিব ভঙ্গুর শরীরে সম্পন্ন হয় না। গার্হস্থ, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস, এই আশ্রম চতুষ্টয়ের ভোগেচ্ছাও সময়-সাপেক্ষ। বিশেষতঃ এক একটী পন্থার অভ্যস্থ চিন্তাকে উঠাইয়া দেওয়াও সহজ বিবেচনা হয় না। মানুষ, যখন কোন প্রকার অভ্যাসগত ভাষা সহজে ছাড়িতে পারে না তখন প্রত্যেক পন্থা প্রদর্শিত শিক্ষার অভ্যস্থ গতি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে এটি সহজ হয় কি? এই কারণে, অবশ্য বলিতে পারা যায়, "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং", ইহা বড় সহজ নহে। ধর্ম্ম ধৃ ধাতু হইতে সিদ্ধ, ইহা সকল অবস্থাকেই ধারণ করে। গৃহীর কি সন্ন্যাস না হইলে মুক্তি হইবে না, ব্রহ্মচর্য্য ধারীর কি বানপ্রস্থ ভিন্ন উপায় নাই! গৃহাশ্রমে কি ঈশ্বর থাকেন না?

হা! বিবিধ বিপদ সঙ্কুল সংসার ভীরু হইয়া গিরিগুহা নির্জ্জন বাসে আত্মসুখ-তৃপ্ত যোগী হইলে কি হইবে? জগতের

সেবাই যে প্রকৃত ধর্ম্ম, এটি অরণ্যব্রতধারী যোগীরা স্বীকার করেন না। জানেন না, ঈশ্বর যে অনন্ত সংসারী—অথচ নির্লিপ্ত উদাসী। সমুদ্রগর্ভে একখণ্ড প্রস্তর ছিদ্রমধ্যে একটী ক্ষুদ্র কীট বাস করিতেছে, তিনি তাহারও আহার যোগাইতেছেন। আহা! সংসার-সাধকের কি উচ্চ আদর্শ! দুঃখ বুঝিতে না পারিলে সুখের আদর কে করিত? অশান্তির তীব্র তাপ সহ্য না করিলে শান্তির সুবিমল রসাস্বাদন কি প্রাণে অনুভূত হইত? কষ্ট সন্তাপের কশাঘাতে ব্যথিত না হইলে কে সাধনের পথ উন্মুক্ত দেখিত?

মঙ্গলদাতা বিধাতা, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীসকলের রক্ষণাবেক্ষণে অবিশ্রান্ত ব্যস্ত, আমি তীব্র বৈরাগ্যের অনুযাত্রী হইয়া অরণ্যে বল্মীক স্বরূপ কুম্ভক যোগীর মত বসিয়া থাকিব? ছি, ছি, এরূপ যোগী হইতে ইচ্ছা করি না। পৃথিবীতে ধর্ম্মের অভাবে শত শত ভাই ভগিনী দুঃখভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের সেবা করিয়া প্রভুর কথা বলিব না? অরণ্যে আত্মতৃপ্ত যোগীর ন্যায় নির্জ্জনেই থাকিব? না, জগতের নর নারীর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিব; ইহাই ত প্রকৃত ধর্ম্ম ও সাধন। কিন্তু অনেকেই এই বিশুদ্ধ সত্যপালনে বীতস্পৃহা প্রদর্শন দ্বারা কঠোর অরণ্য বাসকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। জনপদ যেন তাঁহাদের নিকট বিষের নিকেতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলে জনস্থানে ও নির্জ্জন বনে সমত্বই দৃষ্ট হইবে। আজ যাহা অট্টালিকাময় ও অসংখ্য জনপূর্ণ, হয় ত কিছুদিন পর সেই স্থানটী শ্বাপদ সমাকীর্ণ নিবিড় অরণ্য হইয়াছে। আবার বিবিধ বৃক্ষবল্লী পরিবৃত বনও রাজনগরীতে পরিণত হয়। তবেই দেখুন

বিশ্বপতির অচিন্ত্যশক্তি স্বজন নির্জ্জন, সংসার অরণ্যকে ভেদ করিয়া রহিয়াছে, এজন্ম গৃহস্থাশ্রম অরণ্যাশ্রম উভয়েরই তুল্য অবস্থা। কারণ, বরাহ ভল্লুকের গভীর চীৎকার, তীব্র বিষধরের ফোঁস ফোঁস শব্দ, বিহঙ্গকুলের কলরব, মুহূর্ত্তকালও বিরাম নাই,—ঐস্থানটী কি নির্জ্জন নিরাপদ হইতে পারে? আর যদি তাহাই তৃপ্তির শেষ বলিয়া বিবেচনা হয়, তবে সংসারকেও ত তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যায়। আসক্তির ঘোর অন্ধকার মধ্যে দেষ দম্ভ ক্রোধাদি দুষ্প্রবৃত্তি সকল সতত বিচরণ করিতেছে, ইহারা কি বনের বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু হইতে দুর্ব্বল? স্পষ্টই বলা যাইতে পারে উহারা সহস্রগুণে বলশালী, দুর্দ্দমনীয় ও হিংস্রক। ঐ সমস্ত পাশব বৃত্তিই ত মনুষ্য ও পশ্বাদি সকল প্রকার প্রাণী মধ্যে বিহার করে, তজ্জন্য সংসার ও বন পৃথক্ নহে, একই স্থান। যিনি বীরসাধক, যিনি হৃদয়বিহারী পশুবৃত্তি সমূহকে নিরস্ত করিয়াছেন, তিনি নির্ভীকান্তঃকরণে জগতের সকল স্থানেই শান্তিলাভ করেন।

তবে বলিতে পারেন, সংসার নিরাপদ হইলে, ঋষিরা বনে বাস করিয়াছিলেন কেন? সাধনের বিঘ্ন সম্ভাবনার স্থল বুঝিয়াই ত তাঁহারা যুদ্ধাদি বিপদ সঙ্কুল পৃথিবীর ভোগসুখ হইতে নিবৃত্ত হন? বস্তুতঃ তাহাই বটে, কিন্তু অগ্নির ভিতরে শীতলতা, দুঃখের ভিতরে সুখ, যাতনার ভিতরে শান্তি এবং ঐশ্বর্য্য সম্পদেও যে প্রকৃত তৃপ্তি আছে, তাঁহারা সে সময় অবশ্য ভাবেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা ত্যাগী-বৈরাগ্যের বিষম ঝটিকাতে স্ত্রী পুত্র পরিজনকে বিষদৃষ্টে পরিত্যাগ করেন নাই। বনেও ঐ পরিবার দ্বারা তপস্যার যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছিল। ভাবিয়া দেখিলে,

গৃহস্থাশ্রমের সহিত কোন বিশেষত্ব ছিল না। সংসারেও ত সত্য প্রেম শান্তি ধৃতি ক্ষমা বৈরাগ্য ও সৎপ্রবৃত্তি সকলি আছে, প্রত্যেকেই যদি হৃদয়কে সাধনের পবিত্র ক্ষেত্র করিতে পারেন, ঐশীশক্তি কেনই বা না প্রকাশ পাইবে? স্ত্রী-পুত্র পরিজনেরাই বা কেন সাধনের সহায় হইবে না?

শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়, বিষ্ঠা চন্দন সমজ্ঞান ও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাস ব্যতীত ব্রহ্মচিন্তা সম্ভবে না। তাহা হইলে যাঁহারা জনপদে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহারা কি ব্রহ্মের অমৃত আশ্রয়ে পরিতৃপ্ত হইবেন না? আর যদি সকলই সন্ন্যাসী হন, তবে সংসার ত উৎসন্ন হইয়া যায়, ঈশ্বরের জগৎ সকলের প্রয়োজন কি? বাস্তবিক ইহা কি প্রকৃত সাধন? বোধ হয় না। সকল প্রকার আসক্তি হইতে নিবৃত্তি, ঐ নিবৃত্তি পথও সংসারে প্রশস্ত রহিয়াছে। ঐশ্বর্য্য ও ইন্দ্রিয়ভোগ বাসনায় পুত্রের আকাঙ্ক্ষা, তাহাই পাপ—পরমাত্মার সহিত আত্মার মধুর ভাবে যেমন প্রেম জন্মে, তদবস্থ ভাবে সাধ্বী স্ত্রী সেবা দ্বারা পুত্র লাভ, ইহা কি আসক্তি শূন্য বিশুদ্ধ সন্ন্যাস নহে? পুত্রটী জন্মিল, কিছু দিন পর শরীর ত্যাগ করিল, প্রভুর বস্তু প্রভুতেই থাকিল বলিয়া আনন্দে যিনি অশ্রু বিসর্জন করেন, তিনি কি উদাসী নহেন? বিবিধ উপাদেয় বস্তুতে ইচ্ছা নাই, অথচ ভোজন করিলেও লোভ হয় না, এরূপ অবস্থাকে ত বৈরাগ্যের বিরোধী বলা যায় না? গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া যোগী এবং বহু মূল্যের পরিচ্ছদ, সোণার ঘড়ী প্রভৃতি ব্যবহারেও যদি বাবু বা সম্ভ্রান্ত ভাব মনে না আইসে, এমন সংসারী কি সন্ন্যাসী নহেন? নিঃস্বার্থ ভাবে জগতের সেবায় চিত্তকে ডুবাইয়া দিলে কি ব্রহ্মচিন্তার অধিকার জন্মে না?

ভস্ম রুদ্রাক্ষধারী হইয়া পর্ব্বত বন ভ্রমণ করিলেই কি সন্ন্যাসী হয়? ফল মূল ভক্ষণ অথবা অনশন বিধানে পঞ্চতপা কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা শরীর শুষ্ক করা, উহা কি বৈরাগ্যের লক্ষণ? অন্তর্বৈরাগ্য প্রচ্ছন্ন থাকিলে বহির্বৈরাগ্যে কিছু হয় না। আবার আসক্তির বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলে, স্বর্ণ পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াও সন্ন্যাসের কোন প্রকার ব্যত্যয় ঘটে না। মনের সহিতই বৈরাগ্যের সম্বন্ধ। চিত্ত প্রক্রিয়া প্রলোভন-প্রমত্ত হইয়া বাহ্য সাধনে বদ্ধ হইয়ে, প্রতিনিয়ত ভস্ম লেপন করিয়া কি কখনও সন্ন্যাস হয়?

সন্ন্যাস তত্ত্বে গৃহী ও অরণ্যবাসী সকলেরই সমান অধিকার আছে। বাস্তবিক যখন মানবের হৃদয় ঐশী শক্তিতে আকৃষ্ট হয়, তখন ভয়ানক উদাসীনতার তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। অসহিষ্ণু দুর্ব্বল ব্যক্তিরাই তীব্র বৈরাগ্যের তাড়নায় নির্জ্জন গিরিগুহা আশ্রয় করে। কিন্তু ধৈর্য্যশীল দুর্জ্জয় বলশালী সংসারী কেমন সুন্দর স্থির ভাবে বৈরাগ্যের উৎপীড়ন সহ্য করেন! গাত্রে কারুকার্য্যবিশিষ্ট কাশ্মিরী শালের জোড়ার প্রতি দৃষ্টি পড়িবা মাত্র ভাবিলেন এ কি! সম্পদ সম্ভ্রম ত অনর্থের মূল, ঐযে দুর্ভিক্ষ প্রকোপে শত শত নর নারী ছট্ ফট্ করিতেছে—তজ্জন্য তাহা তখনই প্রেরণ করিলেন। বুকের উপর সোণার চেন গাছটা ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে, তাহা প্রীতির বস্তু নহে—সর্পদংশনের যাতনা বোধে তাহা প্রচার মন্দিরে দান করা হইল। কাচ প্রভৃতি বিবিধ বস্তুর দ্বারা গৃহ সজ্জিত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট জুড়ীর গাড়ী বৃথা ভাবিয়া ঐ সকলের সঞ্চিত অর্থে—যাহারা উদরান্নের জন্য অকূল-জলে ভাসিতেছে, তাহাদের নিমিত্ত একটী অনাথ আশ্রম খুলি-

লেন। নিজের গাত্রবস্ত্রের ব্যবস্থা লক্লোর তুলাভরা মেরজাই, সোণার চেনের পরিবর্ত্তে একগাছি কাল ফিতা, যাতায়াত সম্বন্ধে কোনস্থানে ট্রামওয়ে কোথাও বা পাদচারে গমন। দেখুন ত, বনের বৈরাগ্য কি সংসার-বৈরাগ্যের সম্মুখে আসিতে পারে? ঐ তীব্র বৈরাগ্যযুক্ত কুম্ভক যোগীতে ও বল্মীকেতে কোন বিশেষত্ব ত দেখা যায় না? ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কি এই যে জগৎসমূহ ঐরূপ মানব বল্মীকে পূর্ণ হউক? তাহা হইলে তিনি মহাপ্রাণরূপে প্রত্যেক প্রাণীর সেবায়মগ্ন থাকিতেন না। তিনিই ত সকলকে অভিন্ন জীব তত্ত্বের সেবা-মাহাত্ম্য শিক্ষা দিতেছেন; অন্ন জল বাতাস দিয়া কেমন জীবের সেবা করিতেছেন। অস্থি মেদ পূর্ণ সুন্দর শরীর দিয়া সকলে কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন, একা মানবে নয়,পশু পক্ষী কীটাদি পর্য্যন্তে—জলে স্থলে অনন্তআকাশ তাঁহার সেবার অধিকার।

আমি নিতান্ত জঘন্য! ত্যাগী বৈরাগ্যের উত্তেজনায় সেবার ভাবে বঞ্চিত হইয়াছি। হায়! এমন যে দেব দুর্ল্লভ সেবা ধর্ম্ম, বুঝিতে পারিলাম না। পরপিণ্ডপোষিত হইয়া সময় নষ্ট করিলাম, প্রভুর নিকট কত যে অপরাধী, বলিতে পারি না। তবে তিনি মহাপাপাকেও পরিত্যাগ করেন না, এই আশ্বাসে আবার বলি, প্রকৃত সন্ন্যাস কোথায়? সংসার ও অরণ্য উভয় স্থানেই থাকিতে পারে, যদি জগতের সেবার ভাব জীবিত থাকে। তাহা হইলে, সন্ন্যাসের মূলতত্ত্ব বুঝা যায়, কিন্তু বনবাসে তাহা অসম্ভব। স্বর্ণ যেমন রজতের সঙ্গে মিলিত হইলে উজ্জ্বল জ্যোতি দেখাইতে পারে না, তেমনই সেবা ধর্ম্মানুরাগী সংসারীও পর্ব্বতে গেলে মলিন আত্মসুখী হইয়া পড়েন, আর পৃথিবীতে আসিতে

চান না, আসিলেও সেবার ভাব থাকে না, ব্যাঘ্র চর্ম্মের আসনে গুরু হইয়া বসেন। শুষ্ক বৈরাগ্যের দংশনে স্থির থাকিতে পারেন না, শীঘ্রই হিমালয় বা ওঁকার নাথ গমন করিতে হয়। আবার এটিও সত্য যে,বেশী দিন থাকিলে গুহ্য,সঞ্চিত ধর্ম্মতত্ব লোকালয়ে বাহির হয়, সেটিও ত অধিক চিন্তারই কথা। সরিয়া পড়িলে, সংসারের বিষ-সিক্ত বাতাস গায় লাগে না, কেনই.বা বলিবেন না, আঃ—কি আরাম!

এস্থলে স্পষ্টই বুঝিতেছি, ঈদৃশ গুরু সম্মানে সম্মানিত উচ্চভাব থাকিতে ক্ষুদ্রতার মহত্ব কিরূপে জানিব? ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শক্তির মধ্যে যে ক্ষুদ্র শক্তিই প্রবল, একথা অতি গূঢ়, আমরা বুঝি না। একটী দুর্জ্জয় বলশালী প্রকাণ্ড হস্তীকে যদি অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতে ফেলিয়া দেওয়া যায়,তাহা হইলে সে কখনই বাঁচেনা,তাহার অস্থি পর্য্যন্ত চূর্ণ বিচূর্ণিত হয়। কিন্তু পিপীলিকাটী কত ক্ষুদ্র, তাহাকে তদবস্থায় ফেলিয়া দিলে সে হেলিতে দুলিতে, নানা ভঙ্গী ভাবে, পড়িবামাত্র, বেগে চলিতে থাকে। বুঝুন ত, ক্ষুদ্রতার ভিতরে উচ্চ শক্তির ক্রিয়া কেমন সুন্দর! সম্মান-প্রিয়তার উচ্চাভিমান কি পরাজয় নহে? ইহ সংসারে বা পর্ব্বত গুহায় সজন নির্জ্জন, ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষ যিনি ক্ষুদ্র হইতে পারেন, তিনিই ধন্য এবং প্রকৃত অনুরাগী, বৈরাগী অথবা সন্ন্যাসী।

যাহা হউক,বানপ্রস্থ ও গার্হস্থ উভয় বিধ সন্ন্যাস তত্বই উপরে বিবৃত হইল, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাস কাহাকে বলিব? আমার মনে হয়, আশ্রম-অনাসক্ত সন্ন্যাসই ঐশী শক্তি সম্পন্ন। তাহা না হইলে, বিশাল বিশ্বরাজ্যে, দেশে দেশে, গ্রাম নগর বিভাগে একত্র বাসের ব্যবস্থা কেন! দু-চারিটী ত্যাগী সন্ন্যাসী

হিমালয়ের শেষ পার্শ্বে নির্জ্জন গুহায় রাখিয়া দিলেই ত হইত। তবেই বিবেচনা হয় যে, বিশ্বনিয়ন্তারও ইচ্ছা—আশ্রম-অনাসক্ত সন্ন্যাস। অস্পর্শ মহাশক্তি রূপে সকলের মধ্যেইত বিহার করিতেছেন এবং জগৎকে আশ্রম-অনাসক্ত বৈরাগ্য তত্ত্ব বুঝাইতেছেন। তিনি যদি ত্যাগী বৈরাগ্যের মত্ততাকেই ঠিক জানিয়া চীন তাতারের সমীপবর্ত্তী কোন একটী নিভৃত গুহাতে থাকিতেন, তবে অসংখ্য জনপূর্ণ সংসারের দশাই বা কি হইত, ঐ কয়টী সন্ন্যাসী লইয়াই বা কত সুখী হইতেন?

এস্থলে স্পষ্টই বিবেচনা হয়, সন্ন্যাসের গূঢ় মর্ম্ম বিশেষরূপে অনেকে বুঝিতে না পারিয়া গৃহস্থাশ্রমের প্রতি ঔদাস্য প্রদর্শন করেন। শ্মশান-বৈরাগ্যে জীবনকে শ্মশানের ন্যায় করিয়া তুলেন, বস্তুতঃ তাহা সম্পূর্ণ ভুল। অবিদ্যার শাসন হইতে কোথাও মুক্তি নাই, সর্ব্বত্যাগী হইয়াও ঐ গুহাটী, ঐ কমণ্ডলুটী, ঐ মৃগশাবকটীর জন্য ব্যাকুল হইতে হয়। সেই স্থান টুকু যেন "জননী জন্ম ভূমিশ্চ"—বলিয়া বোধ হইতে থাকে, অরণ্যেও আসক্তির রাজত্ব। সূক্ষ্মভাবে দেখিলে কোথাও নিরাপদ দেখা যায় না, অথচ সংসার-বন সর্ব্বত্রই নিরাপদ। প্রাণে যখন ব্রহ্ম চিন্তার উদ্রেক হইতে থাকে, তখন কি কলিকাতা মন্দ এবং ওঁকার নাথ বা হিমালয় পর্ব্বতই ভাল বলিয়া বোধ হয়, বিশ্বরাজ্যের সকলই যে আপনার হইয়া যায়। কে বিনীত, কে দুর্বিনীত, এ-সকল বিচার আর থাকে না, লোকালয় অমৃতময় হইয়া যায় এবং সাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া প্রতীতি জন্মে। তখনই বনের বৈরাগ্য গৃহীকে আলিঙ্গন করিয়া শান্তি লাভ করে, বুঝিতে পারে বহু জনাকীর্ণ জনস্থানে সন্ন্যাসের বীরত্ব কেমন মধুর।

এইত আশ্রম-অনাসক্ত বৈরাগ্যের সহিত ত্যাগীর মিলন। এখন দেখা যাক্, পর্ব্বতের পরমহংস কি বলিতেছেন। শুনিতে কৌতুহল হয় কি? বাস্তবিক ত্যাগী সন্ন্যাস হইতেই পরমহংসের প্রকৃতি। কিন্তু বায়ু-স্তম্ভিত কুম্ভকাদি স্ববীর যোগীর মত নহেন, তাঁহার আশ্রম অনাসক্ত উদাসীনতা প্রাণের প্রিয় ও প্রার্থনীয়। তিনি কখন বা পর্ব্বতের গুহ্য গুহায় পরমানন্দ ভোগ করেন, কখন বা লোকালয়েও সর্ব্বভূতময় ব্রহ্মজ্ঞানে ভেদকে দলিত করিয়া স্বর্গীয় প্রেমের ভাবে চির-সন্তপ্ত নর নারীর প্রাণে আশা দেন। জাত্যাভিমান মহাপাপ পদতলে অবনত, সকলের হস্ত-অন্নে পরিতৃপ্ত। ভোজন করাইয়া দিলে ভোজন করেন, নতুবা না।

ঈদৃশাবস্থাতেও একটুকু বলিবার কথা আছে। আশ্রম-অনাসক্ত ব্যক্তির উদাসীনতার সঙ্গে যোগ থাকিলেও তিনি পূর্ব্বের ত্যাগী সন্ন্যাসের অসহিষ্ণু প্রভৃতি ভাব হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। কিন্তু আশ্রম-অনাসক্ত পরমহংসকে তাহা ভোগ করিতে হয় না। স্ত্রী পুত্র বহু পরিজনে পরিবৃত হইয়া, সেবা ধর্ম্মের সাহায্যে "মৌলিস্থিতঃ কুম্ভঃ পরিরক্ষনিয়ঃ" এই ভাবে ব্রহ্মযোগে পরমানন্দ ভোগ করেন। ব্রাহ্মসমাজ জাতিভেদ করেন না, অভেদময় ভ্রাতৃভাবই ইঁহার একমাত্র হৃদয়ের সঞ্চিত সম্বল। বস্তুতঃ গার্হস্থ্যাশ্রমের পরমহংসের সহিত ত্যাগীর অসামঞ্জস্য ভাব কিছুই নাই, তীব্র সন্ন্যাস বিভিন্ন মাত্র। ভাবিয়া দেখিলে তাহাও দোষের নহে। ত্যাগী পরমহংস যখন প্রত্যেক পরিবারই ব্রহ্মময় ভাবেন, তখন একদিকে দেখিতে পাই, তিনি সরলতার আশ্রয় দাতা। তথাপি তিনি সেবা বর্জ্জিত বলিয়া গৃহস্থাশ্রমের অনাসক্ত

পরমহংসের নিকট অবশ্যই লজ্জিত, এ কথার সংশয় নাই। পবিত্রাত্মা পরমেশ্বর যে সেবা-ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন।

আশ্রম-অনাসক্ত সন্ন্যাসী, ত্যাগীর ব্রহ্মভাব বিষয়েও কোন বিষয়ে ন্যূন নহেন। তিনি তন্তু কীটের মত সংসারের বিপজ্জালে জড়িত ও বিভু-প্রদত্ত পরিবার, সেবাশৃঙ্খলে-নিবদ্ধ, এমন অবস্থাতেও কেমন সুন্দর নলিনীদলস্থিত জলের ন্যায় অস্পর্শ ভাবে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন। এ কি সাধন-বীরত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নয়? আরও দেখুন, অধিকাংশই যোগ-প্রবর্ত্তকেরা সংসারের অশেষ প্রকার বিঘ্ন বিপদ সহ্য করিতে না পারিয়া ত্যাগী হইয়াছেন, ফলতঃ গৃহস্থাশ্রমী সাধকগণ বিপজ্জালকে যেন শরীরের বর্ম্ম করিয়া বীর সাধনের জলন্ত ব্রহ্মভাব দেখাইতেছেন। আমি মনে করি, গিরি পুরী ভারতী প্রভৃতি যে সকল সন্ন্যাসী দেখা যায়, সরল হৃদয়ে ভাবিয়া দেখিলে, গৃহস্থাশ্রম-সন্ন্যাসের নিকট তাহারা সকলেই দুর্ব্বল। শোণিত শুক্রময় শরীর গ্রহণ করিয়া, জগতের ধারাবাহিক উন্নতির জন্য যে পুত্র কন্যার প্রকাশ, ইহার পথ অবরোধ কি ঈশ্বরের ইচ্ছার বহির্ভূত নহে? অথচ দেখিতে পাই, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে ঘোর সংসারী। * কাঁসর ঘণ্টার বাদ্যোদ্যমে ধাতু প্রস্তরাদি নির্ম্মিত বিগ্রহ পরিবার লইয়া নির্জ্জীব গার্হস্থ ধর্ম্মে উন্মত্ত, ইহা অপেক্ষা প্রকৃত সংসারের সেবা, কি দোষের? যাক্ সকলেই বুঝিতেছেন, অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই।

এখন ঊর্দ্ধরেতা মহাযোগী কি বলেন? ইন্দ্রিয়-সংযমই

---

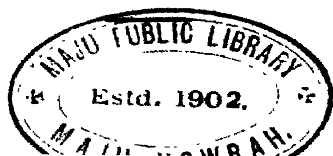
* ইহাঁদের জমিদারী, বাগ বাগিচা, বাণিজ্য ব্যবসায় প্রভৃতি সকলি আছে, কোন বিষয় অভাব নাই। মালদহ মুর্শিদাবাদেই অধিকার বেশী।

ত্যাগীর নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র ধর্ম্ম, ইহার সহিত গৃহীর সাক্ষাৎ করিবার সাধ্য নাই। আমি একথা বলি না, ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাস-তত্ত্বে বীরত্ব নাই। তাঁহাদের মত সংযমী যোগী সংসারে অতি বিরল। কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে সংযমের মূলতত্ত্ব আমাদের অনভিজ্ঞতা-দোষে উৎসন্ন যাইতেছে। তথাপিও, সংসার ক্ষেত্রে সাধন শ্রেণী বিভাগে, কোন কোন সম্প্রদায় মধ্যে যাহা দেখিতেছি, তৎসম্বন্ধে নিরাশার ভাব মনে হয় না। ঊর্দ্ধরেতার অর্থ কি প্রাণীর বিনাশ! ইহা কখনই সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। অযথা শুক্রপাত না করিয়া ঐশী নিয়ম রক্ষার্থ ধর্ম্মপত্নীর ঋতু সমাগম কালে, নিঃস্বার্থ ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা মহাযোগে প্রেম স্বরূপ পুত্র ও প্রীতি স্বরূপা কন্যা প্রকাশ হয়। এ বিষয় সংক্ষিপ্ত ভাবে ইতঃপূর্ব্ব উক্ত হইয়াছে, প্রসঙ্গ ক্রমে এখানেও বলিতে হইল; দৈহিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত থাকিলেও ব্রহ্মের অভিন্ন মিলনের মগ্নাবস্থাই সন্ন্যাস। যে সময় পার্থিব কামনা কিছু থাকে না, তাহাই বিশুদ্ধ সন্ন্যাস তত্ত্ব। এতদ্ভিন্ন যিনি ইন্দ্রিয় চরিতার্থে অযথা শুক্রপাতকে মহাপাপ বুঝিয়া ধর্ম্ম সাধন করেন, তিনি কি সংযমী ঊর্দ্ধরেতা নহেন? এরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ আশ্রমোর্দ্ধরেতার সংযম বীরত্ব, কে না স্বীকার করিবেন? তাই ভাবি, আমরা যেন মনের কল্পিত সংযম প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বাহিরে ঊর্দ্ধরেতা না হই।

বাস্তবিক, বিভুর অখণ্ডনীয় নিয়ম পালন না করিয়া, প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে এবং সংসারের সেবাধর্ম্ম উপেক্ষা করিলে, অপরাধই সম্ভব। তজ্জন্য বলিতে হয়, ত্যাগীর তুলনায় অনাসক্ত সন্ন্যাস কিছুতেই দুর্ব্বল নহে। গৃহস্থাশ্রম-সন্ন্যাসী সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠভাব দেখাইতেছেন। এস্থলে অনেকে

আপত্তি করিতে পারেন, সংসার কি সাধনের যোগ্য ক্ষেত্র হইতে পারে? কেন হইবে না? মায়াময়ী পৃথিবী ত ঈশ্বরের পরিত্যজ্য বলিয়া বিবেচনা হয় না। ঐ বৃক্ষ বল্লী সমাকীর্ণ পর্ব্বত কাননই তাঁহার আদরের, ইহাও ত সম্ভব নয়। যদি, গৃহীগণ স্বার্থচিন্তা ও অহম্ভাবাদি হইতে মুক্তির জন্য চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উপযুক্ত ঐশ্বরিক তত্ত্বের বিধান সমূহই বা কেন সংরক্ষিত বা আদৃত হইবে না? সার্ব্বভৌমিক উদারতা ও সরলতাই বা কেন মানব সমাজকে অধিকার করিবে না? অনাসক্ত সন্ন্যাসই বা কেন জাগ্রৎ ভাবে সকলকে দীনতার উপদেশ দিবে না?

ঋষিদিগের ধর্ম্মবিভাগ ব্যবস্থানুবর্ত্তী অধিকাংশ ব্যক্তিই বলেন, সে কি—সংসারে সন্ন্যাস! এ কি কখন হইতে পারে? পৃথিবী সর্ব্বদা সংগ্রাম, রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দে ও হস্তী অশ্বাদির পদোত্থিত ধুলিপটলে আচ্ছন্ন থাকিবে, অজস্র অসংখ্য নররক্তে স্নান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে, এখানে আবার ব্রহ্মচিন্তা বা সন্ন্যা-সের কথা কি? ইহার উত্তরে বলিতে হয়, ঐ বিশ্বাস কি চিরপ্রসিদ্ধ? এখন এরূপ চাপা দেওয়া কথা আর থাকিবে না। অনেকেরই প্রাণে সাধুভাব জ্বলিয়া উঠিয়াছে, শাস্ত্র-ঝলসিত চক্ষু বেশ পরিষ্কার হইয়াছে,হৃদয়ে সদ্গুরুর উপদেশ বুঝিতে শক্তি জন্মিয়াছে। সংসার ও বন এক অনন্ত অনাসক্ত পরম সন্ন্যা-সীর ভিতরে মগ্ন রহিয়াছে। অতঃপর গৃহস্থাশ্রমে সন্ন্যাস সাধন অসম্ভব বা বিস্ময়ের কথা নহে। প্রত্যেক নরনারী যদি ঐশ্বরিক নিয়ম অনুসরণ করিয়া মধুর মহাযোগে সংযমী হন, তাহা হইলে সংসার স্বর্গসুখ প্রদান করিবে, সন্দেহ কি?



ধ্যান বা চিন্তা।

প্রাণীমাত্রেই এক একটী চিন্তার অনুসরণ-প্রিয়। কেহ বা ধনৈশ্বর্য্যের নিমিত্ত বিজ্ঞান চিন্তায় মস্তিষ্ককে এতই আলোড়িত করিতেছেন যে, মুহূর্ত্তকালও বিরাম নাই। কেহ বা গ্রহ উপ-গ্রহের গতি স্থিতি নিরূপণে, এমন কি, ঐ তেজোময় সূর্য্য কি কি পদার্থে গঠিত, তাহার আবিষ্কার ও অনুসন্ধানে এমনই ধ্যানে মগ্ন যে বাহ্যজ্ঞান-রহিত হইয়াছেন। কেহ বা পৃথিবীর সপ্তকীর্ত্তি মধ্যে তাজমহলের কারুকার্য্য কৌশলে অবাক্ হইয়া দিবারাত্র সেই অতুলনীয় চিন্তাতে ভাসিতেছেন। একা মনুষ্য কেন, পশু পক্ষ্যাদিরও শাবক রক্ষা ও আহারের জন্য চিন্তা অবিচ্ছিন্ন। এই অর্থে কি বলা যায় না, সকলেই ধ্যানী? ইহাই ধ্যানের প্রকৃত তত্ত্ব?

সংসারের প্রত্যেক ব্যাপার মধ্যে ধ্যান অথবা চিন্তাশক্তি নিহিত আছে বটে, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। ঐ প্রাণিহন্তা ব্যাধ, পাখীটার প্রতি যে অকম্পিত শর লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাকে কি বলিতে পারা যায়, সে ধ্যানী? অথচ ইহার ভিতরে ভক্ত সাধু-ভাবে শিক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক ব্যাধকেও গুরু বলিয়াছেন। এস্থলে বুঝিবেন, স্পর্শমণি যেমন লৌহময় বস্তু সকলকে স্বর্ণ করিতে পারে, কিন্তু নিজে নিষ্প্রভ প্রস্তর, তেমনই ঐ পাখীটির প্রতি নিষাদের শরলক্ষ্যভাবে অন্যের উন্নতি হয় বটে, ফলতঃ ব্যাধের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না, তাহার হৃদয় যে পাষাণ হইতেও কঠিন। ইহাতে স্পষ্টই বিবেচনা হয়, ঐশীচিন্তার অভাবে স্থূল বস্তুর ধ্যানে ডুবিয়া গেলেও তাহা শান্তির কারণ নহে। এবং পদার্থগত বিজ্ঞান

চিন্তাতেও চিত্ত যতই কেন ডুবুক না, তাহাতে প্রকৃত ধ্যান বা চিন্তা দ্বারা সুখী হওয়া যায় না।

ধ্যানের চারিটী ভাব আছে। বিজ্ঞান প্রশ্বাস কর্ষণ, বিরাট, অনন্ত। প্রথমটী, ইতঃপূর্ব্ব যাহার উল্লেখ করা গেল, উহা বিজ্ঞান-চিন্তা। দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণ নাসিকার দ্বার হইতে হৃদয়স্থিত ব্রহ্মকে বাহির করিয়া, কোন একটী ক্ষুদ্র পাত্রে নানা প্রকার পুষ্পে পূজা ধ্যান দ্বারা, আবার প্রশ্বাস প্রক্রিয়াযোগে হৃদয়েই স্থাপিত করা, ইহা প্রশ্বাস কর্ষণ ধ্যান বা চিন্তন। তৃতীয়তঃ, ধাতু প্রস্তরাদি নির্ম্মিত কল্পিত মূর্ত্তি—চন্দ্র, সূর্য্য জগৎ ইত্যাদি সাকার তত্ত্ব সকল ও সর্ব্বব্যাপী মহাশক্তিকে একত্রীভূত করিয়া বিরাটরূপ ভাবনা। * চতুর্থতঃ সূচিকা ছিদ্র প্রবিষ্ট সূত্রের ন্যায় ধ্যানসূত্রে স্থূলতত্ত্ব সমূহ ভেদ করতঃ একমাত্র নিরাকার নিত্য বস্তুর ধ্যান অথবা অনন্তকে চিন্তা।

এই ধ্যানভাব চতুষ্টয়ে, নিরাকার অনন্ত চিন্তা প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন অন্যবিধ ধ্যানের অবস্থাকে যোগীরা গন্তব্য পথের সময়-পাত বলিয়া স্বীকার করেন। স্থূলতত্ত্বময় বিজ্ঞানে ক্ষণকালের জন্য তৃপ্তি, প্রশ্বাস কর্ষণ ব্যাপার ইন্দ্রজাল খেলা, সাকার নিরাকার বিরাট ভাবনাতেও যোগবিভ্রাট হয়, এজন্য অনন্ত

---

* গীতায় লিখিত আছে ব্রহ্মের এইরূপ—

দিব্য মাল্যাম্বরধরং দিব্য গন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্য ময়দেব মনন্তং বিশ্বতো মুখম্।

অর্থাৎ তিনি দিব্যমাল্য ও দিব্য বস্ত্রধারী দিব্য গন্ধদ্রব্যে অনুলেপিত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, প্রভাময়, অনন্ত এবং সর্ব্বত্র মুখ বিশিষ্ট। ইহাকে কিরূপে বিরাট ও নিরাকার অনন্ত বলা যায়?

চিন্তাই শ্রেষ্ঠ ও ধ্যানী সাধকের সিদ্ধাবস্থা। এই বিশুদ্ধ ধ্যান-যোগে ব্রহ্মোপলব্ধির অধিকার জন্মে, অন্তর্দৃষ্টি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পায়, ইন্দ্রিয়াসক্তির কূটবন্ধন ছিন্ন হয় এবং মর্ম্মপ্রবিষ্ট বাসনার গ্রন্থী সমূহ শিথিল হইয়া যায়। চিত্তের বহির্মুখ তীব্রগতি ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে থাকে, বহিশ্চিন্তার উত্তেজনায় স্বার্থ প্রলোভন-পূর্ণ সংসারের নানা পথে ভ্রমণ করিতে আর ইচ্ছা হয় না। শুভবৃত্তি-প্রদর্শিত পবিত্র পথের অনুসরণে কামাদির দুর্জ্জয় বল দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সাধক সকামজনিত তৃপ্তি একবারে পরিত্যাগ করেন এবং নিষ্কাম যোগশক্তির আকর্ষণে অনাসক্ত বৈরাগ্যের সাধন-সাহায্য বুঝিতে সক্ষম হন।

ঈদৃশ অবস্থাকে ধ্যান-প্রবর্ত্তক বলে। যে পর্য্যন্ত সাধকত্ব শক্তি না জন্মে, সে পর্য্যন্ত ব্রহ্মচিন্তা বা ধ্যানের গূঢ়তত্ত্ব বুঝা যায় না, নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। তাহার মধ্যে বিষম বিপদসঙ্কুল আমিত্বের বিচিত্র লালসায় পৃথিবীর ঘটনা সমূহ বুদ্‌বুদের ন্যায় অবিশ্রান্ত ফুটিতে থাকে, এই নিমিত্ত সাধকত্ব শক্তির প্রয়োজন। বাস্তবিক ধ্যান রাজ্যে আবার ঐ ভয়ানক অন্ধকারই অকৃত্রিম বন্ধু বা সহায়। যদি আমিত্বের আধিপত্যকে বিনাশ করা যায়, তবে আর কিছু থাকে না, একমাত্র অন্ধকারই গতি স্থিতির উপায়। চিত্ত তখন সেই ভীষণ অন্ধকার ঠেলিয়া কোথায় যাইবে? অগত্যা একাকী মহদ্ভয়ে আক্রান্ত হইয়া স্বভাবতঃ ব্রহ্মনাম না ধরিলে আর উপায় কি? কিন্তু নাম সাহায্যেও সাধকের ভয়ঙ্কর পরীক্ষা আছে, কারণ সে উপায়হীন বলিয়া তাহার নামে রুচি; এজন্য বিশ্বাস ব্যাকুলতা দৃঢ় কি দুর্ব্বল, কেনই বা প্রভু জানিবেন না! উত্তরোত্তর

ভয় বিভীষিকাও অসহিষ্ণু দুর্ব্বলভাব প্রবল হইতে থাকে। আসক্তি-আকর্ষিত ছায়াময় মায়া-শরীরী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভৃতির প্রতিকৃতি দর্শন, তাঁহারাই অভীষ্ট দেবতা ও গতি মুক্তি দাতা পরিত্রাতা, ইত্যাদি প্রলোভনে মহাপ্রভুর মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, কোন একটী অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পতিত হইতে হইবে, আশ্চর্য্য কি ? যিনি নিরাকার অনন্ত নিত্য সত্যের চিন্তা ব্যতীত বাঁচেন না, তিনি প্রকৃত বিশ্বাসী ও অকৃত্রিম ব্যাকুলতার ভিখারী। সম্মুখে যতই কেন পরীক্ষা প্রলোভন আসুক না, বিশ্বাসের জলন্ত তেজে তিষ্ঠিতে পারে না, তাহা ঐ নিবিড় অন্ধকার মধ্যেও ঐশীপ্রভা তড়িজ্জ্যোতির ন্যায় দৃষ্ট হয়। এই আশার দীপ জ্বলিতেছে, ইহা সাধনের পরিণাম এবং সাধকত্বের ফলও বটে, কিন্তু ধ্যানের সিদ্ধাবস্থা নহে।

ধ্যানের সিদ্ধাবস্থা কি ? ব্রহ্মে মনশ্চক্ষুর নিষ্কলঙ্ক দৃষ্টি বা লক্ষ্য স্থিরকরা। "জ্যাসা নাগরীকা চিত গাগরীমে"; ভোজনে, ভ্রমণে, শয়নে স্বপনে অবিনাশী নিত্য পুরুষের ধ্যান বা চিন্তা। যাঁহার চিত্ত দিগ্‌যন্ত্র শলাকার ন্যায় অবিচলিতভাবে ধ্যানে নিরত নিমগ্ন রহিয়াছে, সম, দম, তিতিক্ষাদির দ্বারা বিষম বিষয়াসক্তির যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, পবিত্রাত্মার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অবিচ্ছিন্নধ্যানে একটুকু বিচ্ছেদ ঘটিলে যিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হন, তাঁহারই এক রূপ সিদ্ধাবস্থা বলা যায়। নতুবা ধ্যানাবস্থায় হাইকোর্টের নজীর ভাবিলে সকলই বৃথা। নিষ্কাম বিশুদ্ধ চিন্তাই ধ্যানযোগ। সন্তানের শরীরপাত, ঐশ্বর্য্যের ক্ষয়, স্বাস্থ্যের অভাব, এরূপ সকল অবস্থার উপর অনাসক্ত বৈরাগ্যের জয়, ইহাই ধ্যানের অনুকূল অবস্থা। বলিতে কি, মানুষ যতক্ষণ

বাসনার দাসত্ব হইতে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ ঐ মর্ম্মঘাতিনীর অব্যর্থ আকর্ষণে অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া বেড়ায়। তবেই দেখুন, বাহ্যবস্তুর সহিত চিত্তের যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক, তাহা অনাসক্ত বৈরাগ্যই ঘুচাইয়া দেয়। কাজেই সাধন হিতৈষী বন্ধু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃই সাধন পথে বিশ্বাস বৈরাগ্য ব্যাকুলতার আশ্রয় ব্যতীত অভীষ্ট চিন্তার প্রতি সম্যক প্রকারে নির্ভর শক্তি জন্মে না, এজন্য প্রথমতঃ ঐ সমূহ দেবতত্ত্বেরই সেবা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। ইচ্ছাসিদ্ধ হইলে,ব্রহ্মসাধন ও ধ্যানের কোনরূপ বিঘ্ন বিড়ম্বনার আশঙ্কা থাকে না।

শাস্ত্রে সাধনতত্ত্ব বিবিধভাবে বিবৃত রহিয়াছে। সকল প্রকার সাধন মধ্যেই প্রবর্ত্তক, সাধক ও সিদ্ধ, এই তিনটী অবস্থা আছে। ধ্যান সম্বন্ধেও তদ্রূপ ব্যবস্থা আছে। মানুষ সহসা প্রক্রিয়া-বশীভূত হইয়া প্রথমেই প্রবর্ত্তক অবস্থায় বিস্তৃত ক্রিয়ায় জড়িত হইলে, সাধকত্ব প্রাপ্তির সময় কৈ, যে ষট্‌চক্র ভেদের মত দুর্জ্জয় জটিল পথকে অতিক্রম করিয়া সিদ্ধাবস্থায় পঁহুছিতে পারে? বিশেষতঃ জড়বিজ্ঞান, প্রাণায়াম কুম্ভকাদি তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধরিয়া প্রহরীর কার্য্য করিতেছে। আহা! সাধন-সুলভ প্রবর্ত্তকাদি ভাবত্রয়ের স্বাভাবিক গতির প্রতি কি ইহারা এতই বীতস্পৃহ যে, নাসিকার উপরে চিত্তকে না বসাইলে আর কোন উপায় নাই? এইরূপ বহুবিধ অসাড় সাধন দ্বারা সাধকের সিদ্ধাবস্থার আশা করা নিতান্ত অসম্ভব। আবার অনুকূল দিকে তাকাইলে এ সকলও ত থাকে না; পরিশেষে ক্লান্ত হইয়া সমুদায় পরিত্যাগ করিতে হয়। একটুকু ভাবিয়া দেখিলে কি বুঝিতে পারা যায় না যে, সকলের ভিতরে এক মহত্তত্ত্ব বিরাজ

করিতেছে—স্বাভাবিক তত্ত্ব জ্ঞান। ইহা আপনা হইতেই প্রকাশ পায়, ইহা জড়ীয় বিজ্ঞান বা ঐন্দ্রজালিক কোনরূপ ক্রিয়ার অধীন নহে। জীবনশাস্ত্রদর্শী যোগীগণ বুঝিতে পারেন বলিয়া তাঁহারা প্রক্রিয়াগত প্রবর্ত্তকাদির সাধন বিষয়ে অনুরক্ত হন না, অথচ ঐ অবস্থাত্রয়ে,স্বাভাবিক ভাবে ব্রহ্মশক্তি বর্ত্তমান দেখিয়া সিদ্ধিলাভ করেন।

বাস্তবিক, বিশ্বাস বৈরাগ্য ব্যাকুলতা প্রভৃতি দেব তত্ত্বের সহিত চিত্তের অমিয় ভাবে মিলন হইলে, সকলই সহজ হইয়া যায়। নির্ভব-বিরুদ্ধ প্রক্রিয়াদির কার্য্য সমূহ যে সাধন পথের বিঘ্ন, তাহা স্পষ্টই বিবেচনা হয়। সাধকদিগের জ্যোতিশ্চক্ষু উন্মেষিত হইলে বহির্দৃষ্টি দ্বারা যে সমস্ত প্রলোভনে প্রাণকে আকুল করে, তাহা কিছু থাকে না। এক মাত্র ব্রহ্মচিন্তা ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠে, হৃদয়-দেবতার ভাবনা ব্যতীত আর কোন বস্তুতে স্পৃহা থাকে না। বেদ বিজ্ঞানাদির বিধান সকল তাঁহাদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া পড়ে। জীবন-শাস্ত্রের আভিধানিক শব্দ বা ভাষা তাঁহারা বুঝিতে পারেন, পৃথিবীর বিজ্ঞান-তন্ত্রাদির শাসনে কখন বদ্ধ থাকেন না, মোহ পিঞ্জর ভেদ করতঃ অনন্তের পাখী অনন্তের মধ্যে ছুটিয়া বেড়ান। জগতের বিচিত্রতার ভিতরে থাকিয়াও কিছু দেখিতে পান না—কেনই বা দেখিবেন? সাধকচিত্ত যে অবাতকম্পিত দীপ-কলিকার ন্যায় একমাত্র ইষ্ট চিন্তায় নিরত, টলিবে কেন? চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির, বাক্‌স্ফূর্ত্তি সত্ত্বেও মূক। নিদ্রিতাবস্থায় যেমন আত্মশক্তি সুস্বপ্নযোগে স্বর্গের অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে নিমগ্ন থাকে, পার্থিব শরীর সর্প-শঙ্কবৎ বৃথা হয়, তেমনই সাধকগণের

চিত্ত ব্রহ্ম ধ্যানে ডুবিয়া যায়। সম্মুখ দিয়া বহুজনাকীর্ণ মহা বাদ্যোদ্যমে একটী বৃহৎ বৈবাহিক ব্যাপার চলিয়া গেলেও দেখিতে শুনিতে পান না। তখন তাঁহাদের পার্থিব ইন্দ্রিয় সকল অসাড় হইয়া যায়, এজন্য তাঁহারা জগতে অবস্থিতি করিয়াও স্বতন্ত্র।

ধ্যানীর ব্রহ্মচিন্তাই কর্ম্মযোগ। ঐ নিবিড় অন্ধকারই সহায়, মহত্তরই বন্ধু, ব্রহ্মনাম সূত্রই অসীম আকাশে স্থিতির উপায়। সেখানে প্রভুই উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক। আচার্য্য উপাচার্য্যের অধিকার নাই, যদি থাকে এমন কেহ বুঝেন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃত ধ্যানী নহেন, পতন আশঙ্কা তাঁহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণই সম্ভব। এজন্য ধ্যানীগণ, অনন্ত পথমধ্যে কোন প্রকার পরিমিত রূপ অথবা স্থূল বস্তুর রেখামাত্র দৃষ্টি করিলে অশনিপ্রহারবৎ যাতনা বোধ করেন। বিহঙ্গমগণ যেমন শবরের শর নিঃসরণ শব্দে আকুল প্রাণে অসীমাকাশকেই নিরাপদ স্থান বুঝিয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকে, তেমনই, ধ্যানীরাও উপযুক্ত প্রলোভনপূর্ণ কোন রূপ বাধা বিঘ্ন দুর্ঘটনাতেও, ব্রহ্মই আশ্রয়দাতা, এই দৃঢ় বিশ্বাসে ধ্যানবলে চলিয়া যান। কারণ তাঁহাদের ব্রহ্মপ্রদর্শিত অভ্রান্ত পথই যে লক্ষ্য—তাঁহারা মানবীয় অপূর্ণ শক্তির উত্তেজনায় বিচলিত হইবেন কেন? বিশেষতঃ মধ্যবর্ত্তী ভাবে যে পূর্ণাঙ্গ ধ্যানের অবস্থাকে ম্লান করে, তজ্জন্য তাঁহারা সতত সতর্ক।

ধ্যানের চারিটি ভাব সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে ভাবচতুষ্টয়ের বিষয় সামান্যতও কিছু বলা আবশ্যক। নিবৃত্তি, সত্যনিষ্ঠা, ব্রহ্মভাব ও চিন্তাযোগ ধ্যানের এই চারি অবস্থা। নিবৃত্তি অর্থে সিদ্ধাবস্থা, সাধকের ইহাই মূল ধন। এই মূল

সৎশক্তির বলে সত্যনিষ্ঠা ও ব্রহ্মভাব প্রকাশ পায় এবং উজ্জল পথ উন্মুক্ত করিয়া চিন্তাশক্তিকে মহাশক্তি মধ্যে মগ্ন করে। উহাকেই ধ্যানযোগ বলে। স্ফটিক প্রস্তর তুচ্ছ, স্বচ্ছ চিন্তাই ধ্যান নামে অভিহিত। ইহার ভিতরে কোন ব্যক্তিশক্তি প্রতিবিম্বিত হয় না। ইহাতে কোনরূপ বর্ণ অর্থাৎ নীল লোহিতাদি রং নাই, অথচ অনির্ব্বচনীয় শোভা আছে। আহা! ঈদৃশ চিত্তমুগ্ধকারিণী চিন্তা না হইলে কি সাধক কখন ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য ভাব বুঝিবার জন্য পাগল হন? রাজপুত্র শাক্যসিংহ ছয় বৎসর অবিচ্ছিন্ন চিন্তা দ্বারা নির্ব্বাণ ধর্ম্মেও পৃথিবীকে উন্মত্ত করেন। আহার নিদ্রা ভোগসুখের প্রতি তাঁহার স্পৃহা ছিল না, থাকিবেই বা কেন! স্বর্গের সুধাপানে ক্ষুধা তৃষ্ণা আলস্য-জৃম্ভণাদি যে পরাস্ত! বাস্তবিক যখন সাধকের প্রাণ মহাপ্রাণের দিকে ছুটে, তখন কি 'আমার' বলিতে কিছু থাকে? আবার সমস্তই 'আমার' বলিয়া মনে হয়, কারণ, পশু পক্ষী মানব সকলই পিতার পুত্র। এইজন্য মহাজ্ঞানীরা আপনাদিগকে ভুলিয়া জীবের সেবায় অনুরক্ত হন। সংসারে সমভাবে নিঃস্বার্থ সেবা ধ্যান আরও মধুর।

এখন দেখা আবশ্যক যে, চিন্তাশক্তির মহোচ্চ ভাব কি? কোন্ উপায়েই বা সহজে ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন হইতে পারা যায়? প্রশ্নোত্তরে বুঝিবেন, ব্রহ্মচিন্তা বা ধ্যানের দুইটী গতি ও দৃষ্টি আছে, একটী ঊর্দ্ধ গতি, দৃষ্টি মস্তিকে; অন্যটী সাম্য গতি, দৃষ্টি হৃদয়ে। এই উভয়বিধ গতি দৃষ্টি মধ্যে প্রথমতঃ ঊর্দ্ধ দৃষ্টির ধ্যান সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্। বেদ ও তত্ত্বদর্শী ধ্যানীগণ মস্তিষ্কের ব্রহ্মচিন্তা, ইহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া সাধন করেন, এবং ব্রহ্মবাদী না আসিলে শ্রবণ জন্য আকুল হইলে বিবেকের কৃপা অর্থাৎ

ব্রহ্মের আদেশ হৃদয়েই প্রবেশ পায়। যদিও মনোবৃত্তির স্থিতি-মন্দির মস্তিষ্ক—হইলে কি হয়, প্রভু যে হৃদয়াকাশেই বাণী, ধ্বনী, আদেশ বুঝাইয়া দেন। অবশ্যই বলিতে পারা যায়, মস্তিষ্ক-কোষে মনের চির অধিকার থাকিলেও মন দিবাচন্দ্রের ন্যায় নিষ্প্রভ। কারণ, আদেশ ভাবের মধুর ধ্যান তাহাতে হয় না, সোঽহং তত্ত্বেরই প্রভা উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। ঈদৃশ প্রখর জ্যোতিঃ মধ্যে চিত্ত স্তিমিতপ্রভ কেনই বা হইবে না? এজন্য সরল ধ্যানীরা ইহাকে তীব্রতাপযুক্ত শুষ্ক ধ্যান বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। সমদৃষ্টিরূপে হৃদয়কোষে চিত্তকে স্থির করিতে পারিলে অধোর্দ্ধ উভয় দৃষ্টি সমান হইয়া যায়। প্রেমোন্মত্ত চিত্ত প্রতি ঘটনার মূলে আদেশ তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হয়। মাতৃক্রোড়ে শিশু যেমন জননীর অমিয়মাখা স্নেহবাক্যে তৃপ্ত হইতে থাকে, তেমনই অনন্ত জননীর পূর্ণ স্নেহে ধ্যানস্থ চিত্তও ডুবিয়া যায়। স্বর্গীয় অখণ্ড ভাবাবেশে ধ্যানীর জীবন্ত জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতে থাকে। উর্দ্ধদৃষ্টির তীব্রধ্যানের উত্তাপ শক্তি হৃদয়ের প্রেমাকর্ষণে শীতল হয়। তখন সেই অনাদি সচ্চিদানন্দ মহাপ্রভুর জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। চক্ষের পলক কাল ইষ্টচিন্তার বিচ্ছেদ ঘটিলে অশ্রুজলে সকল শরীর ভাসিয়া যায়।

আবার ঐ অশ্রুই অখণ্ড ধ্যানের সহায়, নিবিড় অন্ধকারেই পন্থহারা পথের সঙ্গী, ব্রহ্মনামই একমাত্র আশ্রয়। প্রভু ত সহজে ছাড়েন না। ঐ যে পরীক্ষা আসিল, মহত্তমের ভীষণ শক্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। আমিত্বের উত্তেজনায় পার্থিব সুখকামিনী চিন্তা সকল ফুটিয়া উঠিল। তখন ব্রহ্মনাম ভিন্ন আর উপায় কি? ভয়বিহ্বল চিত্ত, হৃদয়জ্যোতি ব্রহ্মনাম

গাহিতে আরম্ভ করিল, পথের ব্যাহতা আমিত্ব আর থাকিতে পারিল না। এখন, একমাত্র কজ্জললাঞ্ছিত গভীর অন্ধকার ভিন্ন কিছু দৃষ্ট হয় না। মুহুর্মুহু মহস্তয়ের আবির্ভাব, তাহার ভিতরে "আমি আছি, ভয় কি, ভয় কি।" একি! তবে ইনি কি মহাকালী অভয়দায়িনী মা! ঘন অন্ধকারই বুঝি ইহাঁর রূপ। অপরিসীম অন্ধকার হইতে "আমি আছি" "মাভৈ" এই কথা মাত্র। কোন প্রকার রূপ দেখা যায় না, কে যে সস্নেহ মধুর ভাবে সান্ত্বনা দ্বারা নিঃসহায় জঘন্য পাপী পথিককে কথা কহিয়া আশা দেয়, বুঝিনা। কত স্তুতি, মিনতি, বন্দনা ও প্রার্থনা করিলাম, "আরও চল" কথা ভিন্ন আর কিছু শুনিনা। প্রাণে আঘাত পড়িল—"কথা কহিলে অবশ্য রূপ আছে, নতুবা কোথা হইতে কথা আইসে?" অনতিবিলম্বে শব্দ হইল "মহাশূন্য হইতে", চুপ করিয়া থাকিলাম। ভাবিলাম, যিনি অনন্ত, নিরাকার তিনি কেন শুক্রশোণিতময় শরীরপিঞ্জরে বদ্ধ থাকিবেন? নিরাকার নিত্য চৈতন্য, জন্ম মৃত্যুর অধীন হইবেন; ইহাত কখনই সম্ভব হয় না। তাহলে মানুষ, মানুষকে ভজিয়াই ত উদ্ধার হইত! এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইতেছি। এমন সময়ে, জটাভস্মভূষিত তেজঃপুঞ্জ শরীরের আভা দৃষ্ট হইল। দেখিতে দেখিতে সম্মুখে আসিলেন এবং কত যে স্নেহভাবে আশ্বাস দিয়া পরিশেষে বলিলেন "বুঝিয়াছ"? অদ্ভুত অচিন্ত্যলীলা! ধন্য পরীক্ষা! নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে বলিয়া ফেলিলাম, বুঝিয়াছি। ভাব গতিক জানিয়া অন্তর্হিত হইলেন। আসক্তিপ্রসূত ছায়াময় দেবতা অনেকে আসিলেন, স্বপ্রকাশবৎ পার্শ্বতঃ প্রত্যেকের আশ্বাস বাক্যও শুনিলাম। ইহাই ধ্যানের

পরিণতি ও অভীষ্ট সিদ্ধি; তৃপ্তি হইল না। ঐ মহাশব্দ "আরও চল" ইহাতে দৃঢ়তা বুঝাইয়াই কি সকলে প্রস্থান করিলেন ?

মুহূর্ত্ত মধ্যেই অনুপমের জ্যোতিঃ অনন্তব্যাপী, অন্ধকার কোথায় ? নিঃশব্দ কথা নাই। তবে এ সকল কি কল্পনা ? কিছু পরেই ঐ অসীম অতুলনীয় আলোকের ভিতরে "আরও চল" কথামাত্র অনন্তের অন্ত নাই। কোথায় যাই, অবিশ্বাস আসিল, তখনি বিভূতির ছটা ঘটা বাড়িতে লাগিল। ঐ বিভূতি অনুভূতিও অখণ্ড। তথাপি সন্দেহ পাপী যে ছাড়ে না। হায় ! এ সকলও বুঝি আসক্তির ব্যাপার, বা, পার্থিব স্থূল চক্ষুর অন্তঃ-প্রবিষ্ট দৃষ্টির বিকার ! বোধ হয় না। সূর্য্যের জ্যোতির সঙ্গে জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়, এত সেরূপ দৃশ্য নয়। ইহার ভিতরে যে "তুমি আমি" ভিন্ন আর কিছুই নাই। নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক অসীম জ্যোতির মধ্যে "আমি আছি" শব্দ মাত্র। এই অসীম আকাশ পথে ঐ শব্দ-সূত্র অবলম্বন করিয়া চলিতে পারিলে, এবং ধ্যানের অটল শক্তি অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিলে, ধ্যানী সিদ্ধাবস্থায় আসিতে সক্ষম হন। তাহা হইলে স্বাভাবিক ধ্যানযোগের গূঢ় মর্ম্মভেদ করিয়া অতুল আনন্দময় দর্শন-পথ পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

ধ্যান-যোগে ব্রহ্মের বিভূতি ঐশ্বর্য্য পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় এবং ব্রহ্মদর্শন পথে উপনীত হইবার শক্তি জন্মে। ইহাই বুঝিয়া শাস্ত্র বলিতেছে "ধ্যানভাবশ্চ মধ্যমঃ।" বস্তুতঃ প্রক্রিয়া বর্জ্জিত স্বাভাবিক ধ্যানের অবস্থা অতি বিশুদ্ধ। ধ্যান মধ্যমাবস্থায় অবস্থিতি করিলেও স্বভাবতঃ তাহার দৃষ্টি অনন্তে, ধ্যানীর উন্নতির সহায়, এজন্য বিশুদ্ধ স্বাভাবিক ধ্যান, যোগী ভক্ত

সাধক সকলেরই আদরের, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ যখন ব্রহ্মভাবে আসিয়া উচ্চগতি প্রদান করে, পরমানন্দ মহা কোষে আকৃষ্ট করিতে থাকে, বহিরঙ্গ ভাবের বিঘ্ন বিপদ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেয়না, তখন কেনইবা হৃদয়ের বস্তু বলিয়া বুঝিব না? অভেদময় ধ্যানই যোগীর গন্তব্য পথের উজ্জ্বল প্রদীপ। এমন যে জীবন—সর্ব্বস্ব ধ্যান-যোগ, ইহাকেও ব্যক্তিবিশেষে প্রত্যাখ্যান করেন। বৈদেশিক ভাবগ্রাহী ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি-দিগের মধ্যে অধিকাংশই ধ্যান ও যোগের বিরোধী। প্রভুকৃপা করুন! আমরা যেন স্বাভাবিক অনন্ত ধ্যানে মগ্ন হইয়া, ব্রহ্ম-যোগে মিশিতে পারি।



এই কি যোগ?

প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধাবস্থার পরিণতি ধ্যান। ধ্যানের ঘনতাই যোগ। যোগ রাজ্যেও প্রধানতঃ দুইটী ভাব দেখা যায়। একটী স্থূল ও নিরাকারে মিশ্রভাব, দ্বিতীয়টী শুদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক, নিরাকার ভাব। এখন শুষ্ক জ্ঞানের তাড়নায় বাহ্য দৃষ্টির ভিতরে যদি অখণ্ড সূক্ষ্ম দৃষ্টির যোগ করিতে যাই, তাহা হইলে স্থূল বস্তু কিছু থাকে না, আবার স্থূলতত্ত্বের প্রতি স্থূল দৃষ্টি পড়িলে অনন্তত্বও টেঁকেনা। পণ্ডিতগণ, উভয় দৃষ্টির বিরোধ ভঞ্জন সম্বন্ধে একটী বালুকণায় অনন্তের প্রকাশ যাহা প্রমাণ করেন, তাহা প্রকৃত মীমাংসার কথা বলিয়া বিবেচনা হয় না। যদিও ঐ বালু-কণার সূক্ষ্মখণ্ডের ও পরমাণুর শেষ করা যায় না বটে, কিন্তু তাহাতে জড়-চক্ষুর পরিমিত দৃষ্টি ব্যতীত অখণ্ড সূক্ষ্মদৃষ্টি পড়ে

না। কারণ, দিব্য চক্ষুর প্রকাশে স্থূলবস্তু কিছুই থাকেনা। এই নিমিত্ত সাকার নিরাকারে মিশ্রযোগ নিতান্ত অসম্ভব।

ভক্তগণও মহিমা-ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ঐ রূপ মিশ্র যোগ সাধনে অনুরক্ত হন। জগতে বিচিত্র স্ফূর্ত্তি যে প্রভুর পরীক্ষা ও মায়া শক্তির ব্যাপার, তাহা ভক্তির আবেগে গ্রহণ করেন না। সসীম পদার্থে অসীম ভূমানন্দ সত্যস্বরূপের দর্শন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সাগর-প্রণয়িনী স্রোতস্বিনীর কিয়দংশ জল একটী ক্ষুদ্র পাত্রে রাখিলে, ঐ জলে সত্য সত্যই কি চির পিপাসা নিবৃত্ত হয়? ভাবিয়া দেখিলে, বিচিত্র বৃক্ষ, বল্লী, পশু, পক্ষী, মানব সকলেরইত দৈহিকের ভঙ্গুর ভাব। কোটি কোটি জগৎ সকলকে একত্র করিলেওত অখণ্ড মহাশক্তির ভিতরে একটী উপলখণ্ডের তুল্য; এজন্য মহিমা-ঐশ্বর্য্যের পরীক্ষায় আকৃষ্ট হইয়া যোগ করিলে যে যোগবিভ্রাট হয়, একথা কেনই বা বলিব না।

এই যে মিশ্রযোগ, ইহার ভিতরে একটুকু প্রবেশ করিলে বেশ বুঝা যায় স্থূল সূক্ষ্মের সমদৃষ্টি সাধন বড়ই দুরূহ। আপনি স্বর্ণ ও রজতকে এক স্থানে রাখিয়া কি একমাত্র স্বর্ণজ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন? কখনই নয়। স্থূল দৃষ্টিতে পৃথক করিবেই করিবে। আবার একথাও সত্য, যে স্বর্ণ ও রজত উভয় পদার্থে জ্যোতিঃ এক, অথচ বস্তুর শক্তিপ্রভাবে বিভিন্ন জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিতেছে। কিন্তু এক মূল জ্যোতির প্রতি জ্যোতিশ্চক্ষুর দৃষ্টি পড়িলে এক, ভিন্ন আর দুই থাকে না। জড়ীয় বিকৃত ভাবের ছায়া সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে ব্যাখ্যা করিয়া এত দৈর্ঘ গ্রন্থ বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন কি? সরল ভাবে অন্তদৃষ্টিতে অদ্বিতীয়

অনন্তের দিকে চাহিয়া থাকিলেইত সকল গোল চুকিয়া যায়, এবং ত্রিভঙ্গ, গৌরাঙ্গ বানলিঙ্গ ধরিয়া শরীর পাত করিতে হয় না। অন্নময় শরীর-কোষ ত সকলেরই রহিয়াছে, কেনইবা ঐ সকল পরিমিত দৈহিক ভাবের মধ্যে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি দেখিব? নিজ নিজ দেহাধারে দেখিলেই ত যথেষ্ট। প্রভু কি কেবল ঐ সাধুর ভিতরে, আমি পাপী, আমাকে ঘৃণা করেন, শ্বাস প্রশ্বাস অন্নজল দিয়া রক্ষা করিতেছেন না?

যাহা হউক, এক্ষণে যোগতত্ত্বেরই অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া প্রার্থনীয়। পণ্ডিতগণ যে অন্নময়, মনোময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময় হিরণ্ময় পরে কোষে আত্মার স্থিতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে সময়োচিত সাধনের দৃঢ়তার ফল প্রদর্শন করিতে পারে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বর্ত্তমানে ঐ সকল কোষ-পথ ক্রমশঃ পরিভ্রমণ প্রচুর সময় সাপেক্ষ। বিশেষতঃ আত্মার প্রত্যেক কোষে স্থিতি সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক আসক্তির আকর্ষণ ছিন্ন করিতেও অধিক শ্রম-সাধ্যের প্রয়োজন। এক একটা কোষকে আশ্রয় করিয়া পুনর্ব্বার পরিত্যাগ করিতে হয়। এমন বিস্তৃত ভাব অপেক্ষা সহজ ও সরল ভাবে হিরণ্ময় পরে কোষে যাইতে কেন চেষ্টা করা যাক্‌না? এস্থলে বলিতে পারেন, একবারে ব্রহ্মযোগ সাধনা অসম্ভব, ক্রিয়া বা কর্ম্ম সংযোগে শনৈঃ শনৈঃ সাধনের ব্যবস্থা ঠিক। লাফ দিয়াই কি একবারে গাছে উঠা যায়? তবে কি চির প্রসিদ্ধ বিস্তৃত পথ ছাড়িয়া, রেলওয়ের সিধা পথে অল্প সময়ে বৃন্দাবন যাইতে হইবে না? পৃথিবী ত্রিকোণ ভিন্ন আর কিছু না, বুঝিয়া কমলা লেবুর মত উত্তর দক্ষিণ কিঞ্চিত চাপা বলিব না, গোলমালেই থাকিব? সংসার ত চিরকালই উন্নতি

ও অবনতির ভাবে রহিয়াছে। অন্ধকার ও আলো ইহাও অনন্তকাল বর্ত্তমান আছে। স্বাস্থ্য, জরা, দুঃখ, সুখ, এসকলও ত জগতে বিচরণ করিতেছে। বস্ত্রবয়নে শ্বেত নীল সূত্রশ্রেণী যেমন অধোর্দ্ধ দুইভাগে গতিশীল, তেমনই বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক কার্য্যও প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাই বলিয়া এই রূপ পরিবর্ত্তনে কি প্রকৃত সরল সত্যের জন্য ব্যাকুল হইব না? পূর্ব্বতন বৈদিক সাধনা প্রথাতে যে সকল কোষভাব কল্পনা আছে, তাহা বর্ত্তমানে সময় সাপেক্ষ। যাহা হউক হিরণ্ময় পরে কোষ পরেও পরমানন্দময় নামে আর একটী নিত্য কোষ আছে, তাহাকে যোগীরা সিদ্ধ কোষ বলেন। উহাতেই আত্মার জুড়াইবার স্থান। সেখানে বিস্তৃত বক্র পথে যাইতে হয় না, সহজ পথ উন্মুক্ত আছে। যাক্, এখন তান্ত্রিক যে যোগ পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই সংক্ষিপ্তভাবে বলিব। ঐ বৈদিক কোষ কল্পনা ও কুম্ভকের ছায়া ধরিয়া ষট্চক্রভেদ নামে যোগ প্রচার হয়, পূরক, স্তম্ভন, রেচক এই ত্রিবিধ ক্রিয়া দ্বারা বাহ্যিক সাধন করিতে হয়। পরিশেষে বায়ু স্তম্ভিত যোগ সিদ্ধিলাভ করিলে ঐ কোষের ভিতর আত্মাকে বসাইতে হয়। মেঢ্রে চতুর্দ্দল, নাভিতে ষট্দল, হৃদয়ে দ্বাদশদল, কণ্ঠে ষোড়শদল, চক্ষুতে দ্বিদল, মস্তিকে সহস্রদল পদ্ম। হং রং লং বং ইত্যাদি বীজাক্ষর নির্দ্দিষ্ট আছে, মেঢ্র হইতে মস্তিক পর্য্যন্ত ছয়টী চক্রপদ্ম। প্রত্যেক চক্রপদ্মে ষোড়শোপচারে পূজা সমাপন করতঃ, মস্তিক অর্থাৎ সহস্রার বায়ুস্তম্ভিত করিতে পারিলেই যোগ সিদ্ধ হয়। বলিতে পারিনা যে, ঈদৃশ বায়ু স্তম্ভিত যোগে তামসভীর ব্যক্তিকে পরাজয় করিতে পারে কি না—কেনই বা পারিবে না? জড় যোগ যে বিজ্ঞানে

পরিপুষ্ট ও সঞ্জীবিত। নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক পূজার পর বাণলিঙ্গটি গিলিয়া ফেলেন, আবার বিল্বপত্র দিবার সময় অনায়াসে বাহির করেন। আহা! মনের অন্তর্ধৌত করা একমাত্র ব্রহ্মে নির্ভর, তাহা উপেক্ষা করিয়া উদরস্থ নাড়ী বাহিরে আনিয়া ধৌত করিতেছেন। কেহবা মদ্য, মাংস, মৎস্যাদি পঞ্চমকার যোগে মগ্ন হইতেছেন! যাহা হউক, এই সকল সাধন কি ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া নাক দেখান নহে?

জগতে এইরূপ বিজ্ঞান যোগেরই আধিপত্য দেখা যায়। সংসারে অনেকেই অলৌকিক ঘটনাপ্রিয়, এই কারণে তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বের অনুসন্ধানে বীতরাগ হইয়া অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছেন। বায়ুস্তম্ভিত যোগে পার্থিব শরীর স্ফীত ও সবল হয় বটে, কিন্তু ঐরূপ অন্তর্ধৌতাদি ক্রিয়া-শরীর কি ঠিক? না ঈশ্বরে অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্থিতি করিলে তাহাতেই সিদ্ধ শরীর লাভ হয়। যোগিদিগের মধ্যেও অনেকে বাহিরের বিজ্ঞান যোগে মুগ্ধ হইয়া ষড়ৈশ্বর্য্যজনিত ভাগবতি তনুর প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। স্থূলে গড়াইয়া নিরাকার শরীর তত্ত্ব বুঝিতে ইচ্ছা করেন না। রূপক বা কল্পনার কথা নহে। শম, দম, তিতিক্ষা, বিশ্বাস, বৈরাগ্য, নির্ভর, ব্যাকুলতা প্রভৃতি স্বর্গীয় দেবতত্ত্ব সমূহের সমষ্টিই ভাগবতিতনু। ইহাতে ষড়ৈশ্বর্য্যময় ঈশ্বরের ভাব জীবাত্মার প্রকাশ প্রত্যক্ষ হয়, এজন্য ইহাকে যোগ-শরীর বলে। যোগিগণ, যেদ পুরীষাদি পূর্ণ জড় দেহের অতীত ঐ ভাগবতি শরীর লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় গভীর ইষ্ট চিন্তায় মগ্ন হয়েন। পার্থিব তনুর দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত কোনই সম্পর্ক রাখেন না। নলিনী দলস্থিত জলের

ন্যায় সম্বন্ধ মাত্র মনে করেন। এমত স্থলে জড়ীয় পদার্থ সমূহকে নিরাকার তত্ত্বের সহিত একত্রীকৃত করিয়া যোগ সাধনে ব্রহ্ম জ্ঞান হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; কারণ, জগতত্ত্ব সকল ঈশ্বরে অবস্থিতি করিয়াও ভাবের বিকাশ অল্প সংকীর্ণ। এইকারণে ব্রহ্মযোগ ঐ সমস্ত স্থূলতত্ত্ব ও বায়ুস্তম্ভিতাদি ক্রিয়া বা বিজ্ঞানভাবে আদপেই আসিতে পারে না। প্রক্রিয়াবিৎ বিজ্ঞানযোগী কি বুঝেন না যে হঠ প্রভৃতি যোগাদি দ্বারা অর্থাৎ তাড়িতাকর্ষণ ও বায়ুস্তম্ভিত ক্রিয়াযোগে অদূরদর্শিতাই প্রমাণ করে এবং তদ্দারা অভীষ্ট লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। বাস্তবিক প্রক্রিয়া প্রমত্ত যোগ কি ভয়ঙ্কর! বহুশাস্ত্রদর্শী মনিষীগণও স্বার্থসম্মান সূচক জড়বিজ্ঞানের অলৌকিক ভাব প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন না। বরং স্বাভাবিক সরল যোগ তত্ত্বকে অবিশ্বাসের অন্ধকার পথে রাখিয়া যুক্তির তীক্ষ্ণ ধারে খণ্ড বিখণ্ড করিতে থাকেন।

ভারতে বিজ্ঞান ও হঠ প্রভৃতি যত প্রকার যোগ আছে, তাহার মধ্যে রাজ যোগকেই অনেকে শ্রেষ্ঠ বলেন ফলতঃ ইহাতে বিরক্ত বৈরাগ্যের ভয়ানক ঝটিকা সময়ে সময়ে প্রবল হয়, শুনা-যায়। এইনিমিত্ত, ত্যাগী ভিন্ন সংসারীর পক্ষে ইহা বড় দুষ্কর। রাজযোগ ব্রহ্মভাবে আনিতে পারে সত্য, অথচ আত্মাকে সুখী করিয়া অরণ্যের নির্জ্জন কারাগারে বদ্ধরাখে, অভিন্ন জীবসেবার মধুর ভাব বুঝিতে দেয় না। এজন্ত ইহা সন্ন্যাসের ভীষণ আবর্ত্তে পর্ব্বত-গহ্বরের তৃপ্তি সম্ভোগে কলঙ্কিত, আমার মনে হয়, অনা-সক্ত বৈরাগ্যের আশ্রয়ে সেব্য-সেবকের ভাবে যে স্বাভাবিক যোগ, উহাই শ্রেষ্ঠ। ইহার ভিতরে পঞ্চবিধ রস অর্থাৎ শান্ত, দাস্য,

বাৎসল্য, মধুর, দাস্ত গূঢ়ভাবে নিহিত আছে। এইজন্ত উহাতে "সোহহং" প্রভৃতি শুষ্কজ্ঞানের আশঙ্কা নাই। বাস্তবিক, এই পাঁচটী রসের ঘনীভূত অবস্থাই প্রেম; তত্ত্বজ্ঞানও অপ্রভেদ ভক্তি ব্যতীত ঐ বিশুদ্ধ তত্ত্বের স্পর্শসুখ বা আস্বাদন বুঝিতে পারা যায় না। জগতে নর-নারী সকলের হৃদয়ে ঐ বিশ্বজনীন প্রেম; কাহার বা অস্ফুটভাবে কাহার বা উজ্জ্বলরূপে রহিয়াছে। যিনি সেবাতত্ত্বের অনুসরণে উদাসীন, তিনি বুঝিতে সক্ষম নহেন। সাধন বলে ভ্রান্তির অন্ধকার বিনষ্ট হইলে, সেব্যসেবকের গূঢ় তত্ত্ব প্রাণে জাগিয়া উঠে। তখন আর না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না, আহা! দাস্তভাবে সখ্যমধুরাদির সামঞ্জস্য কি সুন্দর! কি অমিয়! অরণ্যবাসী জ্ঞান যোগীর আত্মতৃপ্তি সত্ত্বেও ব্রহ্মে স্থিতি সম্ভবতঃ প্রার্থনীয়। এদিকে জীবের অখণ্ড সেবায়ও এই ভাব; অথচ ইহাতে পঞ্চবিধ রসের মাধুর্য্য ভোগটুকু ও অনায়াসলভ্য।

তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তি উভয় তত্ত্বের সাধনই আদরের। আহা! সেবা-মগ্ন দাস্ত ও পুত্রত্বের গূঢ়মর্ম্ম যিনি বুঝিতে পারেন, তিনি কখনই ঐ স্বর্গীয়ভাব বিস্মৃত হন না। খ্রীষ্টের পিতৃভাব, মহম্মদের (দোস্ত) বন্ধুভাব, নানক প্রভৃতির প্রভুভাব। ভাবিয়া দেখুন বন্ধুভাব হইতে পুত্র ও দাস্য ইহা কত বিনীত। দাস্য আবার সখ্য ও মধুর হইতেও নীচ হইবার ইচ্ছা করে, সখ্য ও মধুর তত্ত্বকি একটুকু সমত্বভাবকে প্রশ্রয় দেয় না? দাস্যভাবেত সেটুকু আইসে না? এইভাবে জগতের সকল প্রকার প্রাণী-মধ্যে সৎস্বরূপের প্রকাশ দেখিয়া উন্নত মস্তক নত হয় এবং সার্ব্বভৌমিক উদার ভালবাসায় কঠিন হৃদয়কেও গলাইয়া দেয়। ইহাতে মানব-গুরুর উচ্চ অভিমান থাকিতে পারে না। শিষ্যগণের

পদধূলি মস্তকে ধারণ জন্ত প্রাণ না কাঁদিয়া আর বাঁচে না। যে পর্য্যন্ত দাস্যভাবের অভিন্ন সেবাহুরাগ ও ব্যাকুলতা স্ফূর্ত্তি না হইবে, সে পর্য্যন্ত যোগ-বিভ্রাট হইবেই হইবে ; কারণ ঈশ্বরে যে সকল শক্তি ও গুণ আছে, দাসত্বে ও পুত্রত্বেও তাহা সর্ব্বতঃ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরে সখ্য ও মধুর ভাবের মিলন হইলেও মমত্বদোষে ক্ষোভবিরহিত, আর আকাঙ্ক্ষা থাকে না। ভাবিয়া দেখুন, খ্রীষ্ট, নানকাদির ইষ্ট লাভ সত্ত্বেও প্রার্থনার বিরাম নাই ; ইহা কি সুখের নহে ? ব্রহ্মকে পাইয়াও আশার প্রবল স্রোত অনিবার্য্য প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই কারণে পুত্র ও দাস্যভাব, মধুর ও সখ্য ভাবাদি হইতে শ্রেষ্ঠ। আবার ইহাও বলি, ধীর গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, পরস্পরের মধ্যে মিলন রহিয়াছে। যেমন এক মৃত্তিকার অন্তঃপ্রবিষ্ট অগ্নি, জল ইত্যাদি, তেমনই শান্ত সখ্য মধুরাদিতেও পুত্র ও দাস্যের বিশুদ্ধ রস মিশ্রিত আছে। এজন্ত তাহারা হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ কেন হইবে না ?

এই ত গেল ভাব যোগের তত্ত্ব। এক্ষণে প্রকৃত যোগতত্ত্ব কি, তৎসম্বন্ধে চিন্তা প্রয়োজনীয়। পূর্ণ পরমেশ্বরের শক্তির বিকাশ জীবাত্মা, মহাশক্তি হইতে কখনই স্বতন্ত্র নহে। অথচ মোহ-যবনিকার অন্তরালে অবস্থিতি জন্ত মনশ্চক্ষুর দৃষ্টি জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য্যে আকর্ষিত হইয়া, ভেদ করিতে পারে না, এজন্ত অনেকেই আপনার মধ্যেই যে ব্রহ্ম স্থিতি করিতেছেন, তাহা ভুলিয়া জড়বিজ্ঞানের বিবিধ যোগ-ভাবে কস্তুরী সৌগন্ধমুগ্ধ মৃগের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন। এক-বার ভ্রান্তির আচ্ছাদন উন্মোচন করিয়া দেখিলে আত্মাতে

পরমাত্মার নিত্যস্থিতি অপ্রকাশ থাকে না। * মোহময় কুজ্ঝটিকা ঘুচিয়া গেলে আর কিছু দেখা যায় না "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইহা ভিন্ন আর ত কিছু নাই। ব্রহ্মই ত "তুমি আমি" মহাভাবে মহা যোগ প্রকাশ করেন। তিনিই দ্বৈতাদ্বৈত মধুর ভাবের অর্থাৎ চিচ্ছক্তির ভাবের বিকাশ জীবশক্তির একত্র যোগলীলা, ইহা যতক্ষণ বহিশ্চিন্তার আসক্তি বিদূরিত না হয়, ততক্ষণ ঐ স্বাভাবিক যোগ স্ফূর্ত্তি পায় না। স্বর্গীয় মহাজ্ঞানের উদয় হইলে, আপনা হইতেই মহামিলন যোগ প্রকাশ হইয়া পড়ে। যেমন শৈবালদামপূর্ণ সরসীর আবর্জ্জনা সকল দূর করিলে, নির্ম্মল জল বাহির হয় ও স্বতঃই কিরণযুক্ত সূর্য্যমণ্ডল দেখা যায়, তেমনই ভেদবিধায়িনী স্থূলচিন্তা চলিয়া গেলে, সেব্য সেবক মহামিলন তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন থাকে না। ইহাতে কোন প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন নাই, এবং মানবীয় উপদেশ ইহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। প্রভুতে নির্ভর, ইহাই কর্ম্ম, হৃদয়ভেদী ব্যাকুলতাই সাধন, ব্রহ্মের আকর্ষণই স্বাভাবিক যোগ। তবেই মনে করুন, কুম্ভক ও হঠ প্রভৃতি যোগ এ সকল বিজ্ঞান যোগ সাধন। এই নিমিত্ত স্বাভাবিক যোগের মাহাত্ম্য বুঝিতে উদাসীন। ইহার অমিয় আস্বাদন কেবল অনাসক্ত সন্ন্যাসভাব সম্পন্ন পরমহংসই ভোগ করেন।

যাঁহারা ভীষণ কোলাহল পূর্ণ জনতার মধ্যেও গম্ভীর ভাবে চিত্তের অকম্পিত লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইতে দেন না ও নির্ভীকান্তঃকরণে স্বাভাবিক সরল পথের অন্বেষণে নিভৃতে চিন্তা করেন, তাঁহারাই সংসারে অনাসক্ত পরমহংস।

---

* চিচ্ছক্তির প্রকাশ, নিরাকার জীবাত্মা অখণ্ড না হইলে, অনন্তের স্থিতি আসে না। স্বরূপ ও ভাবে নিত্য যোগ, ইহাকেই মহামিলন বলে।

যাঁহারা, মৃণাল ছিদ্রভেদী সূত্রের ন্যায় অনন্ত যোগপথে প্রবেশ করেন, গ্রহগণচিত্রিত নক্ষত্রমণ্ডল ও জগৎ সকলে গূঢ়প্রবিষ্ট অস্পর্শ ব্রহ্মশক্তি যোগে, প্রাণীর প্রাণাধার ভেদ করিয়া আত্ম-যোগে সমস্ত জগৎ সুধাময় বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই সংসারে অনাসক্ত পরমহংস।

যাঁহারা, মক্ষিকা যেমন পুরীষে বসিয়া নির্লিপ্ত ভাবে তৎস্থিত মধুপানে মগ্ন থাকে, তেমনই বিকারময় বিপদসঙ্কুল পৃথিবীর ভিতরে ঐশী সুধাপানে ডুবিয়া যান, তাঁহারাই সংসারে অনাসক্ত পরমহংস।

যাঁহারা, "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই মহত্তত্ত্ব বুঝিয়া চিচ্ছক্তি ও জীব শক্তির দ্বৈতাদ্বৈতের গভীর সত্য অর্থাৎ সেব্য-সেবক ভাবের গূঢ়-লীলা প্রাণে ধারণ করেন, তাঁহারাই সংসারে অনাসক্ত পরমহংস।

যাঁহারা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ব্রহ্মনিষ্ঠা, অনীর্ষা, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহ হৃদয়ে সজ্জিত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই সংসারে অনাসক্ত পরমহংস।

যাঁহারা, দ্বেষ, দম্ভ, অহঙ্কার, পরনিন্দা, ও তোষামোদ ইত্যাদি জঘন্য বৃত্তি সকল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিষ্ঠাবান্ এবং হৃদয়উন্মাদক ব্যাকুলতার আশ্রয় লইতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারাই সংসারে অনাসক্ত পরমহংস।

যাঁহারা, জ্ঞান, প্রেম, ভক্তির একত্র মিলন সহবাসে স্বেদ, স্তম্ভ, অশ্রু, কম্প, পুলক, রোমাঞ্চ, হুঙ্কার প্রভৃতি ভাবাবেশে মগ্ন হইয়াও মূর্চ্ছার যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, অনন্তযোগে সমাধিস্থ হয়েন ও পরমানন্দ ভোগ করেন, তাঁহারাই সংসারে অনাসক্ত পরমহংস।

যাঁহারা, এক একটী মানবের বৈজ্ঞানিক শক্তি সঞ্চার ক্রিয়া যোগে পরিতৃপ্ত না হইয়া ঈশ্বরে নির্ভর করতঃ, অগ্রও ভাবে সাধুসেবা দ্বারা আপনাকে নীচ ভাবেন এবং ঈশ্বরই পথপ্রদর্শক গুরু বা শিক্ষাদাতা এই ধ্রুব সত্যে বিশ্বাস করিতে পারেন, তাঁহারাই সংসারে অনাসক্ত পরমহংস।

বাস্তবিক, যিনি সংসারে অনাসক্তভাবে নিরাকার নিত্য-সত্য পরব্রহ্মের স্বরূপসত্তা ভোগ করিয়া জগতের নর-নারীর উদ্ধারের জন্ত ব্যাকুল হন, তিনিই ধন্য। খ্রীষ্ট, ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ ও রক্তার্দ্র শরীরেও ঘাতক ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন,"পিত! উহারা বুঝেনা, উহাদিগকে ক্ষমা কর।" এই বলিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। এখানে বনবাসী পরমহংসের যোগ অপেক্ষা পৃথিবীর ক্রুশাহত যোগীর স্বাভাবিক যোগ কি শ্রেষ্ঠ নহে? তবেই মনে হয়,অস্বাভাবিক প্রক্রিয়াযোগে ব্রহ্মযোগ সাধন করা অসম্ভব, বরং ইহা দ্বারা ঈশ্বরে নির্ভর ও বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তি ভাঙ্গিয়া যায়। প্রাণায়াম প্রভৃতি ক্রিয়া পদ্ধতির অনুসরণে অবশ্য পার্থিব দেহবল বর্দ্ধিত হয় এবং স্বাস্থ্যের সাহায্য করে সত্য, বস্তুতঃ ইহার সহিত ঈশ্বর দর্শনের কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না; কারণ স্থূল বস্তুতে অনন্ত শক্তি নির্লিপ্ত রহিয়াছে। সরল যোগী মাত্রই মায়িক শরীরে তদবস্থভাবে অবস্থিতি করিয়া নিরাকার চৈতন্তযোগে কৃতার্থ হইতে থাকেন। আসক্তিপূর্ণ অপূর্ণ মানবশক্তির প্রতি ভক্ত বিশ্বাস করিতে পারেন না, এই নিমিত্তই তাঁহারা মানবের দীক্ষা ও শিক্ষা অনুকূল বলিয়া স্বীকার করেন না। একমাত্র "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলং" এই অব্যর্থ কৃপামন্ত্রে দীক্ষিত হন ও জীবন-গ্রন্থের দেবভাষা বুঝিতে পারেন।

দেখিতে দেখিতে নিষ্কলঙ্ক বিশুদ্ধ শুভ্র জ্ঞানের উজ্জ্বল আলো তাঁহাদের হৃদয়ে হঠাৎ জ্বলিয়া উঠে, মোহ কুজ্ঝটিকা চলিয়া গেলে, তখনই দুগ্ধে সর্পিবৎ আত্মায় পরমাত্মার মিলন সুস্পষ্ট-রূপে প্রকাশ পায়। উহাই ত স্বাভাবিক যোগ, ইহাতে বুঝিবেন না যে জীবের অস্তিত্ব ঈশ্বরে লীন হইয়া গেল। লবণমিশ্রিত সমুদ্র জল পান করিলে যেমন লবণাংশকে পৃথক ভাবে বুঝা যায়, তেমনই অনন্ত ব্রহ্ম সাগরে জীবত্বেরও স্বতন্ত্রত্ব ঘুচিয়া যায় না। কেনই বা সেব্য সেবকের মধুর লীলা বিনাশ হইবে ?

আহা ! ঐযে. ভাই ভগিনীগণ ! ধ্যানের পর পারে অনুপমেয় জ্যোতিঃ। আহা ! সচ্চিদানন্দ অব্যক্ত রূপ কি সুন্দর ! হায় ! ভাষা ব্যক্ত করিতে অসমর্থ, আকাশেরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত ! একি ! একি ! ঐরূপ দেখিয়াই কি রাজপুত্র শাক্যসিংহ ভিখারী ? নানক, “অনাহত ভেরী বাজেরে” বলিয়া উন্মত্ত ? মেরীপুত্র খ্রীষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হন। মরি, মরি, কি অতুলনীয় রূপ মাধুরী ! দেখিয়াও দেখাইতে পারা যায় না, বুঝিয়াও বুঝাইতে অক্ষম। কি অপরিসীম ভালবাসা, কত সুখ, কত আনন্দ, কত প্রেম, কত শান্তি, সীমা নাই ! দর্শন পিপাসারও নিবৃত্তি হয় না। যতই দেখি, ততই দেখি। আশার দুর্জ্জয় বলে নিরাশার দর্প চূর্ণ। আহা ! কি অনন্ত সৌন্দর্য্য ! বর্ণনা করিতে পার্থিব রসনা পরাভূত। অপোগণ্ড শিশু যেমন মাতার স্তনযুগলে দুগ্ধ পান করে, আর হাত নাড়ে, কিছু বলিবার সাধ্য নাই ; বোবা যেমন মিষ্ট বস্তুর রসাস্বাদন বলিতে পারে না, মনে মনে গুমরিয়া মরে, তেমনই ব্রহ্ম দর্শন সম্বন্ধেও ব্যক্ত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেন না, অতুলনীয় অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়কে ভাষা কি

রূপে প্রকাশ করিবে। প্রাণ কাঁদিতেছে, সকলকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতেছি—যিনি দেখিয়াছেন, তিনি মজিয়াছেন।

কোন প্রকার মাদক বা মর্ফিয়ার খেয়াল নহে। ব্রহ্মকৃপার প্রতি অকৃত্রিম ভাবে নির্ভর করিতে পারিলে স্বাভাবিক জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি, যোগ আসিবেই আসিবে। প্রভু বিনা আর বাঁচি না, অশ্রুজলে হৃদয় ভাসিয়া যায়, এইরূপ অবস্থায় স্বাভাবিক যোগ উদ্দীপিত কেন না হইবে? অশ্রুসিক্ত ব্যাকুলতার সহিত যতই কাঁদিব, ততই শ্বাস প্রশ্বাস স্তম্ভিত, শরীরস্থ ইন্দ্রিয় সকল নিশ্চল, ক্রমে ক্রমে কণ্ঠনালী ও ধমনী সকল রোধ হইবে। চক্ষের দৃষ্টি শক্তি, কর্ণের শ্রবণ শক্তি, শরীরের স্পর্শ শক্তির কিছুই বোধ থাকে না, মানব প্রস্তরের ন্যায় জড় ও নিশ্চল হইয়া যায়। মোহমুক্ত মনশ্চক্ষুর উজ্জ্বল দৃষ্টিতে ভ্রান্তির আবরণ ঘুচিয়া গেলে আপনা হইতে আত্মা পরমাত্মার যোগ প্রকাশ পায়। ইহাকেই স্বাভাবিক যোগ বলে।

যিনি অজর, অক্ষয়, অনাদি, অনন্ত, মহান্, তাঁহাতেই সুখ ও শান্তি। চিত্তের লক্ষ্য স্থির হইলে, আত্মা অভিন্নযোগে ভূমানন্দ ভোগ করে, তখন কোন প্রকার বিকৃত ভাবের আচ্ছাদন থাকে না, অপরিসীম সুধাপানে কৃতার্থ হয়। দ্বৈতাদ্বৈত মধুর ভাবে সেব্য সেবকের মহালীলা শেষ হয় না। এইরূপ অবিচ্ছেদ সেবার গভীর প্রেম চিরস্থায়ী হইলে, তাহাকেই নিত্যযুক্ত সমাধি বলা যায়। আবার চিত্তের অবিচলিত লক্ষ্য সত্তেও আর একটী স্বতন্ত্র ভাব আছে; সেটী যান্ত্রিকতত্ত্বে নির্লিপ্ত যোগ বীরত্ব! কখন বা অন্তর্জগতে আবার ব্রহ্ম সহবাসে বিকার ভ্রান্তি মর্ম্মপ্রবিষ্ট হইয়া আচ্ছন্ন করে, সেইজন্য সৎস্বরূপে

অব্যর্থ দৃষ্টি; কখন বা বহির্জ্জগতে প্রভুর কর্ত্তব্য পালনে অর্থাৎ নর-নারীর সেবায় উন্মত্ত; কখন-বা অসীম যোগানন্দরসে মগ্ন। এই অবস্থাকে ভগ্ন সমাধি বলিয়া থাকে, ইহাই সংসারে অনাসক্ত যোগীদিগের প্রার্থনীয়।

নির্ব্বাণ মুক্তি।

পূর্ব্বে শক্তি-তত্ত্বে জীব-শক্তির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। জীবতত্ত্ব যদি অখণ্ড নিত্য হয়, তাহা হইলে নির্ব্বাণ কাহার হইবে? চিচ্ছক্তির প্রকাশ জীবাত্মা অবিনাশী; এজন্য নির্ব্বাণ সম্বন্ধে গভীর চিন্তারই বিষয়। শাস্ত্র ও সাধুচরিতে নির্ব্বাণ তত্ত্বের মীমাংসা শুনিতে পাই। দীপ যেমন নিবিয়া গেলে তাহার অস্তিত্ব দেখা যায় না, আকাশে বিলীন হয়, তেমনই জীবাত্মাও চিন্ময় সত্যস্বরূপ পরমব্রহ্মে মিশিয়া যায়, জীবত্বের চিহ্নমাত্রও থাকে না। সমুদ্র-বিম্ব ভাঙ্গিয়া গেলে এক মাত্র সমুদ্র ভিন্ন আর কি থাকে? আবার বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ মধ্যেও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ও তাহাদিগের শক্তি ও গুণের একত্র ঘনীভূত অর্থাৎ সমষ্টি শক্তিই জীব নামে অভিহিত। তাহার মধ্যে কোন একটী তত্ত্ব ও শক্তির বিশ্লেষ সংঘটিত হইলে, ঐ জীবত্বের অভাব হইয়া যায়; তাহাকেই পণ্ডিতেরা ধ্বংস বা মৃত্যু বলেন। নির্ব্বাণমুক্তি বলিয়া কোন কথা নাই।

এইরূপ পরস্পর মতের অনৈক্য প্রযুক্ত নির্ব্বাণতত্ত্বের প্রকৃত

মর্ম্ম পরিজ্ঞাত হওয়া সহজ নহে। জীবশক্তি অখণ্ড হইলে ঐ রূপ নির্ব্বাণ অতি অসম্ভব। তত্বজ্ঞানে আত্মার অস্তিত্ব অনন্তে অনন্ত কালের জন্যেই আছে, বুঝাইতেছে। বিজ্ঞান মতে যে জড়ীয় অপূর্ণশক্তি জনিত জীবত্বের অস্তিত্ব, উহারও মূল অন্বেষণ করা নিতান্ত কঠিন। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায়, আমরা ভ্রান্তির আবরণে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মূলতত্বে প্রবেশ করিতে পারিনা। বাস্তবিক অজ্ঞানতাই ইহার কারণ। ইহাতেই প্রকৃত বিশ্বাসকে বিচলিত করে, ভীষণ জটিলতায় সংশয়বাদকে পুষ্টি করিতে থাকে, ঐশীতত্বের অভ্রান্ত সত্য প্রকাশ হইতে দেয় না, এবং বিবিধ প্রকার তর্কযুক্তি বিচার করিয়া স্বাভাবিক সরল ভাবকে ম্লান করে। কেহবা জলে জল মিশিয়া গেল, কেহবা দীপের ন্যায় আত্মার অস্তিত্ব নিবিয়া যায়, ইত্যাদি বহুভাবে নির্ব্বাণমুক্তির ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ নির্ব্বাণ মুক্তি, পুনর্জন্ম, এসকল বিষয় আন্দোলন করিতে গেলে, চরম চিন্তার ফল, জীবত্বের ধ্বংস "ব্রহ্মাহং" অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম। আলস্য পরতন্ত্র মানবদিগের প্রতি যমের কঠোর শাসনের ব্যবস্থা * অনেক প্রকার শুনা যায়। কিন্তু ইহার ভিতরে ঋষিদিগের সদুদ্দেশ্যই আছে। কারণ, প্রকৃত জ্ঞানের অভাব সত্ত্বেও নিশ্চেষ্ট মানবের প্রতি ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উপায় বিধান করিয়াছেন, সোঽহংতত্বেরও একরূপ গোলমাল চুকাইয়া দিয়াছেন।

---

* কিম্বদন্তী আছে—ধর্মচ্যুত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, তাহাকে যমদূত কণ্টকময় দুর্গম পথে অশেষ প্রকার শাস্তি দেয়। আবার যমের সম্মুখে নীত হইলে, তাহার বিচারে অপরাধীর চক্ষু দুইটী সাঁড়াশী দ্বারা তুলিয়া লওয়া হয়।

বাস্তবিক গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, নির্ব্বাণ মুক্তিও পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে স্থূলবুদ্ধি প্রবেশ করিতেই পারে না। তথাপি মানব, স্বভাবতঃ কৌতূহলপ্রিয়, তজ্জন্য সাধ্যাতীত বিষয়েও পরাঙ্মুখ না হইয়া, ইহার সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্ত হয়। এক দিকে ভাবিতে গেলে এই চির বিচার্য্য বিষয়ের প্রমাণ করিতে না পারিলেও ঈদৃশ সদনুষ্ঠানের আলোচনা মহৎ ও প্রার্থনীয়। এই নিমিত্ত দেবর্ষি মহর্ষিগণ যিনি যাহা গভীর চিন্তা দ্বারা স্থির করিয়া ছিলেন, তিনি তাহাই জগতের হিত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এখনও তাঁহাদের আদরের বস্তু বেদান্ত, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র সকল জীবিত রহিয়াছে। কিন্তু কালস্রোত অনিবার্য্য ও মানব প্রবৃত্তিও পরিবর্ত্তনশীল; এজন্য সত্যের সম্যক্ বিকাশও নিতান্ত অসম্ভব। একটী পুষ্করিণী খনন করিতে হইলে যতই তাহার আয়তন বৃদ্ধি হয়, ততই জল ভাগের সীমা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আবার সেই মহদনুষ্ঠানে নিশ্চেষ্ট হইলে ঐ উন্নতি উৎসাহ রোধ হইয়া যায়; সত্যের বিকাশও ঠিক সেইভাবে চলিতেছে। পরিমিত শরীরাধারে মহাশক্তির স্থিতি সত্ত্বেও বিকার দোষে উজ্জ্বলতাব দেখা যায় না, মোহাদির আবরণে আচ্ছাদিত হয়।

যাহা হউক, এক্ষণে জন্মান্তর ও দৈহিক ভাবের বিষয় একটুকু চিন্তা করা যাক্। অনেকে বলিয়া থাকেন, বাসনাবদ্ধ জীবের শরীরপাত হইলে কর্ম্মফল ও দণ্ডের দায়িত্ব ভোগ কখন হইবে, এই শরীরে না পুনর্ব্বার জন্ম হইলে? আহা! ঈশ্বরের কার্য্যও কি (মুলতবী) চাপা পড়িয়া নথীর সামিল নথরের নীচে থাকে? তাঁহার অব্যর্থ বিধানের নিয়ম যে অখণ্ডনীয়।

রোগে, শোকে, দুশ্চিন্তাদির দণ্ড দ্বারা এই শরীরেরই শাস্তি হইয়া থাকে। পার্থিব ঐশ্বর্য্য ভোগিগণ, তাহা উপেক্ষা করতঃ আভ্যন্তরিক শোণিত-ভোজী রাক্ষসীর ন্যায় চিন্তার শাস্তি স্বীকার করেন না, বরং (অমুক ব্যক্তি পাপ করিয়াও কেমন হাসিতে খেলিতে মরিয়া গেলেন ইত্যাদি) নানা কারণ দর্শাইয়া অমোঘ ঐশীবিধান দণ্ডকে অগ্রাহ্য করেন। জন্ম জন্মান্তর জমাখরচের মত পাপেরও দূরবায় করিতে হয়, অথবা কর্ম্মফল অধিক হইলে উদ্ধারের আর উপায় থাকে না। ঐ সকল ঘটনা সম্বন্ধে দুইটী ভাব বুঝিতে পারা যায়,একটী মানবীয় ভাব, আর একটী দেবভাব। প্রথমতঃ মানবীয় ভাবেরই উল্লেখ করা যাইতেছে। চিচ্ছক্তি হইতে মায়াশক্তি, তৎপ্রসূত জগৎ প্রপঞ্চ-ময় পরমাণু পুঞ্জের প্রাবল্যে ভ্রান্তি অহঙ্কার অজ্ঞানতাদির বিকাশ, এবং উহাদিগের একাঙ্গ শক্তিগুণ হইতে মানবীয় ভাবের উদ্ভব হয়। বিশ্বনিয়ন্তার অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম ও ক্রিয়া সংযোগে দেহীর বিকাশ বশতঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সকল ভূতশক্তি সম্পন্ন মানবীয় ভাব, গূঢ়-ভাবে কাম ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ছয়টী বৃত্তি ও দ্বেষ দম্ভাদির আশ্রয়ে বাস করে। শত্রুসমূহ শরীরস্থিত মানবীয় ভাবের আকর্ষণে মন ব্রহ্মে স্থিতি করিয়াও আকৃষ্ট হয়। এজন্য দুর্জ্জয় কামাদির প্রলোভনে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ ও ভোগ-বাসনার ফলভোগ তাহাকেই করিতে হয়। স্থূল শরীর যে অচেতন জড়—রোগ যাতনার অনুভব ও দুষ্কর্ম্মের শাস্তি গ্রহণ মনেরই অধিকার। কিন্তু এরূপ অবস্থাতে চিত্ত দুঃখ যন্ত্রণার ভাগী হইয়াও ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র নহে। কারণ, পরমাত্মার প্রকাশ জীবাত্মা, জীবাত্মার প্রকাশ

মন; যেরূপ সূর্য্যের কিরণ, কিরণের উত্তাপ। উত্তাপই যেমন জড়ীয় পদার্থ সকলকে স্পর্শ করে। মনের অবস্থাও সেইরূপ। মন; চিন্ময়ে স্থিতি করে বলিয়া উহার নাম চিত্ত হইয়াছে। চিত্তের স্বভাব বড় তরল ও চঞ্চল, এজন্য চিৎ এবং জড় উভয় শক্তির সন্ধিস্থানে পড়িয়া কখন মানবীয় ভাবে কখন দেবভাবে স্থিতি করিতে থাকে।

তবেই দেখুন কোটি কোটি দৈহিকভাব, জল বিম্বের ন্যায় উঠিতেছে ভাঙ্গিতেছে বলিয়া কি পরমাণুর ধ্বংস হইতেছে? পশু পক্ষী মানব শরীরের গঠন এক পরমাণু হইতেই ত হইয়া থাকে? দেহের অন্তর্প্রবেশিনী মহাশক্তিতেই ত জীবাত্মা ও মন চেতনভাবে বিরাজ করিতেছে, কেবল ঐ শরীরটীর ভাব দেখিলাম, আর দেখিতেছি না—ইহাই আমরা বিকার চক্ষে দৃষ্টি করিয়া থাকি। দিব্য চক্ষু উন্মেষিত হইলে, ঐ সকল ভ্রান্ত দৃষ্টি ঘুচিয়া বুঝাযায়, ঘট ভাঙ্গিয়া গেল আকাশের অবস্থা অনন্ত ব্যাপী একভাবেই থাকিল। শরীরস্থ স্থূল পদার্থ অর্থাৎ ভূতে ভূত মিশাইলে নিরাকার নিত্য চৈতন্যময় অনন্ত ভিন্ন আর কি থাকে? আত্মাও তাঁহাতে চিরবিরাজ করে। এমত স্থলে পুনঃ জন্ম আবার কি? নিরাকার জীবশক্তির জন্ম মৃত্যু আসা যাওয়া কিরূপ সম্ভবে? তবে যে শরীর বিশেষে শুভাশুভ ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য ঘটনা আমরা দেখিয়া থাকি, তাহা সকলই মানবীয় ভাবের ব্যাপার। মনে করুন, একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকায় শত শত শ্বেত পীত হরিৎ প্রভৃতি কাচ ফলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ সকল আবৃত রহিয়াছে, গৃহের অভ্যন্তরে একটী উজ্জ্বল মণির আলোকে গৃহটি পূর্ণ; অথচ ঐ সকল গবাক্ষ

দিয়া ঐ অবিকৃত মণির প্রকৃত জ্যোতিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে নানা বর্ণে দেখা যাইতেছে। আবার ঐ শ্বেত স্বচ্ছ কাচময় গবাক্ষ গুলিতেও মণির মূল জ্যোতি বাহির হইতেছে। তবেই বুঝিতে হয়,গৃহস্থিত মণির অবিকৃত আলো সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যত্যয় হয় না। মানব শরীরের অবস্থা ভেদেও ঐ গবাক্ষবৎ ভাবান্তর সংঘটিত হইয়া থাকে। এস্থলে বুঝিবেন, আসক্তি জনিত মোহ ভ্রান্তি অজ্ঞানতাদির একান্ত শক্তিতে যে মানবীয় ভাব,তদ্দ্বারাই দস্যুতা প্রভৃতি পাপকার্য্য সমূহ প্রকাশ পায়। আবার অনাসক্ত বৈরাগ্য ও শান্তি ধৃতির মধ্যদিয়া দেবভাবের সত্যনিষ্ঠাদির অনুষ্ঠান ও সম্যক রূপে উদ্দীপ্ত হয়। এই উভয় ভাবের শক্তি প্রত্যেক শরীরাধারেই স্থিতি করিতেছে। এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে, একজন দস্যু দুর্বৃত্ত হইয়া পাপতাপের জ্বালায় ছট্ ফট্ করিতেছে,আর একজন স্বর্গীয়ভাবে ভূমানন্দ ভোগে মগ্ন রহিয়াছেন। এই উভয়বিধ শক্তি ত উভয়ের ভিতরেই আছে, তবে কেন অবস্থার বিভিন্নতা দেখাযায়? এসম্বন্ধে ভাবিতে গেলে বিবেচনা হয় যে, শরীর সত্তা বিশেষে জড়ীয় পদার্থের উপাদান ভেদ, ইহাই মূল কারণ। তজ্জন্যই মানবীয় ও দেব প্রকৃতির পরস্পর আধিক্য বশতঃ ঐরূপ ব্যাপার সম্পাদিত হইয়া থাকে। শরীর সংযোগের তারতম্য হইতে স্বাস্থ্যজরা সুখ দুঃখ, সাধু অসাধু ইত্যাদি ঘটনা হইয়া থাকে। এবিষয় এখানে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, জড় চৈতন্যতত্ত্বে বিস্তৃত ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

এইত গেল মানবীয়-ভাবের কথা, এখন দেব-ভাবের বিষয় কিছু চিন্তা করা যাক্। চৈতন্য স্বরূপের উচ্ছ্বাস-ভাব মন, স্থূল-

তত্ত্বের পরিমিত শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া,দস্তু দেবাদির উত্তেজনায়,সময়ে সময়ে,বিপদ উপস্থিত করে এবং পৃথিবীকে শোণিতসিক্ত করিয়া আত্মম্ভরিতা দোষে আক্রান্ত করে। দুর্দ্দমনীয় রিপুগণের প্রবল শাসনে সাধুচিন্তা, ধর্ম্মানুরাগ, ব্রহ্ম-ভাবে নিষ্ঠা, সদসৎ ইচ্ছা কিছুই থাকে না। তথাপি এমন অবস্থাতেও অচেতন জড়শক্তি,চেতন-শক্তি-সম্পন্ন চিত্তকে বদ্ধ রাখিতে সক্ষম নহে। কারণ বিধাতার অমোঘদণ্ড, প্রতি মুহূর্ত্ত কাল, পাপ প্রবৃত্তির প্রতি বর্ষিত হইতেছে। রেখামাত্র পবিত্রতার সংস্পর্শে দেবশক্তির প্রভা, প্রদীপ্ত হইয়া,মেঘ-নির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় চিত্তকে দেবভাবে অনুরঞ্জিত করে। উহা কামাদির নির্যাতনে বা তাহাদের পাপ প্রলোভনে প্রতাড়িত হয় না, দেবতত্ত্বের অন্বেষণে নিয়ত কাল ব্যাকুল থাকে,"ব্রহ্মকৃপা" স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া পড়ে। ক্রমে ক্রমে বিশুদ্ধ স্বর্গীয় ভাব মর্ম্মভেদ করিলে, দয়া দাক্ষিণ্য ক্ষমা ধর্ম্ম ঔদার্য্য সারল্য এই ছয়টী মহদ্বৃত্তির প্রভাবে মানবীয় ভাব ও ক্রোধাদির বল-ক্ষয় হইয়া দেবভাবের আশ্রয় লইতে শক্তি জন্মে, ক্ষুদ্র কীট হইতে উচ্চ সাধক পর্য্যন্ত কোন বিশেষত্ব থাকে না, সকলের ভিতরে একমাত্র নিরাকার অখণ্ড শক্তিরই প্রকাশ প্রত্যক্ষ হয়,ওটি কীট,এইটী মানব,ইনি অজ্ঞান, উনি জ্ঞানী এই সমূহ ভেদ ভাব মনে স্থান পায় না, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড ও চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির ভিতরে এক অনন্তব্যাপিনী শক্তির কার্য্য দেখিয়া হৃদয়, মন, প্রাণ উৎফুল্ল হইতে থাকে। ব্রহ্মপ্রদত্ত জ্যোতিশ্চক্ষুর উজ্জ্বল দৃষ্টিতে স্থূল দৃষ্টি ও পাপ প্রবৃত্তি আর থাকিতে পারে না, ইহকাল পরকাল অনন্তকালে এক হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে সকলি

মধুময় বলিয়া অনুভূত হয়। তখনই চিত্ত মনুষ্যত্বের পুরস্কার হইতে নিষ্কৃতি পায় এবং দেবভাবে অভিষিক্ত হইয়া বিজয় * লাভ করে।

"আচ্ছা! দেবভাবের তত্ত্বতো বুঝাগেল। ঐ চিত্তই তো আবার মায়াশক্তির ভিতরে মোহাদি পাশবদ্ধ শরীরে অবস্থিতি করে। তবে কর্ম্মপাশ হইতে মুক্তি কোথায়? কোটি কোটি দেহীর আবির্ভাব তিরোভাব হইতেছে,—চিত্ত কোনটীতে মুক্ত কোন-টীতে বদ্ধ, এই জটিল ভাবেতে প্রাণ প্রসন্ন হইতে পারে না। বাসনাজনিত ফলভোগ উড়িয়া গেলে, আমি পাপী,—মরিলেই নির্ব্বাণ বা মুক্তি। আর চিন্তা কি? এক তোলা আফিম্—ইহার ভিতরে একটুকু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে সহজেই বুঝায়ায়। অনন্ত কালই চিত্তের দুইটী স্বাভাবিক অবস্থা আছে। প্রথমটী ভোগ-বাসনা-বিমুক্ত বিশুদ্ধ দেহীর ব্রহ্মানন্দময় অবস্থা, দ্বিতীয়টী রোগ যাতনাদির ভয়ঙ্কর তাড়নার পর নিষ্কলঙ্কভাবে শান্তির অবস্থা। ভাল এই উভয় ভাবই যদি মুক্তির কারণ হইল, তবে আর ঈশ্বরের মনন চিন্তন পূজা প্রার্থনারই বা প্রয়োজন কি? এ সম্বন্ধে বুঝিবেন, সুখ ও যন্ত্রণা দুইটীরই ভোগ যখন স্বতন্ত্র, অর্থাৎ ইশ্বরে যুক্ত থাকিলে দুঃখ যন্ত্রণা থাকে না, বিকার-বদ্ধ ভাবের অবস্থাতেই যাতনা,—তখন ঐ সকল সাধন ভজনের নিতান্ত আবশ্যক। দেহপাত সময়ের যন্ত্রণার উপশম জন্যই ত যোগীগণ উহা অবিচ্ছেদ ভাবে সাধন করিয়া থাকেন। কর্ম্ম-পাশবদ্ধ প্রত্যেক প্রাণীর দেহত্যাগের পূর্ব্বে, স্বতঃই শ্বাস প্রশ্বাস নিশ্চল ও চক্ষুকর্ণ ইন্দ্রিয়াদির শক্তি জড়ীয় সত্তায় বিলীন হইতে

* মানবীয় স্থূল ভাব হইতে ব্রহ্মভাবে প্রকাশ।

থাকে, ততই দুষ্কর্ম্মজনিত কর্ম্মের ফল পরিসমাপ্ত হইয়া, চিত্তের শান্ত সমাহিত দেবভাব প্রকাশ হইতে থাকে। তবে বলুন, জড়ীয় শক্তিতে মানবীয় বিকারতত্ত্ব সকল মিশিয়া গেলে, নিষ্ক-লঙ্ক ভাবে চিত্তও এক ঈশ্বরেই স্থিতি করে। তবে কে থাকিল যে যম রাজার বাগান বাড়ী পরিষ্কার করিবে? স্থূল শরীরের তত্ত্ব সমূহও পৃথিবীর পরমাণুতেই নিবদ্ধ থাকে, তাহার পরিমিত শক্তি ও গুণ অখণ্ড চিচ্ছক্তিকে অতিক্রম করিতে পারে না। আবার চেতন তত্ত্বও অচেতন স্থূল তত্ত্ব মধ্যে বদ্ধ থাকেনা, উহা নিত্য চৈতন্যযুক্ত চির জীবন্ত। এমত স্থলে নির্ব্বাণ মুক্তির বিষয় আর কি বুঝিব? মানুষ ভ্রান্তির আবরণের ভিতর দিয়া যে ব্রহ্মের পূর্ণ প্রকাশকে অসম্পূর্ণ বুঝে, বাস্তবিক তাহাতে কি তাঁহার অখণ্ড জ্যোতি খণ্ড হয়? কখনই সম্ভব নহে। চন্দ্র যেরূপ পৃথিবীর ছায়ায় আছন্ন হইলেও তাহার অবস্থার কোন ব্যাঘাত হয় না, ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হয় বটে, আবার পৃথিবীর ছায়া, গতির-বিপর্য্যয়ে সমস্ত চন্দ্র মণ্ডল প্রকাশ পায়। তদবস্থ ভ্রান্তির ঘোর অন্ধকারে সত্যের উজ্জ্বল আলোক সমগ্রকে গ্রাস করে, আবার ভ্রান্তির ছায়া ক্রমে ক্রমে বিদূরিত হইলে, স্বতঃই ব্রহ্মজ্যোতি প্রকাশ পায়। কর্ম্মজনিত বদ্ধ ও মুক্ত ভাবের অবস্থাও তদনুরূপ।

শাস্ত্রে সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য সারূপ্য এবং জ্ঞান, প্রেম ইচ্ছা প্রভৃতি মুক্তির বিধান ও উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। বর্ত্ত-মান সময়ে ইহাও সহজ যে ব্যাকুল ভাবে হৃদয়, মন, প্রাণ প্রভুকে উৎসর্গ করিয়া দিলে, স্বর্গীয় পবিত্রতার অধিকার করে এবং ব্রহ্ম কৃপা স্বভাবতঃ বর্দ্ধিত হইতে থকে। আর বলিবার অধিক কথা

নাই। নির্ব্বাণ মুক্তির বিষয় চিন্তা করিলে বিবেচনা হয় যে, জড়ীয় বিকার ভাব ও অনিত্য বিষয় বাসনাদির আসক্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই মুক্তি। ফলতঃ এই ভবিষ্যত্তত্ত্বের ব্যাপার ঈশ্বরই জানেন, ইহার মীমাংসা কে করিবে? দৈহিকের অভাব হইলে, যোগীর অবস্থা যোগীই বুঝেন, ভোগীর অবস্থা ভোগীই জানেন। এইজন্যই কি সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—"বলদেখি ভাই কি হয় মোলে?" সঙ্গীতটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখুন। বস্তুতঃই ঈদৃশ ভাবী বিষয় লইয়া আলোচনা চিরকালই হইতেছে, কেহই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইতে পারিলেন না। আমি কিছুই বুঝিনা, কি বলিব?

মহাভাব।

মহাভাব সম্বন্ধে প্রধানতঃ তিনটী তত্ত্ব আছে। প্রথমটী সাম্য, দ্বিতীয়টী স্বরূপ, তৃতীয়টী জীব। এই তত্ত্ব তিনটীর সংমিশ্রনে যোগীভাব প্রাণে অঙ্কুরিত হয়। ইহার সম্যক বিকাশে মহাজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া, কাম্য ক্রিয়াদি অসার ভাবকে বিনষ্ট করে এবং তত্ত্বজ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতিতে বিকারকলুষিত চিত্ত পূত হয়। তবে কেন এমন স্বর্গীয় তত্ত্ব গ্রহণ করিতে শক্তি জন্মে না,—কেনই বা জগতের পরিবর্ত্তনের মধ্যে প্রকৃত তত্ত্বের জন্য প্রাণ আকুল হয় না, কেনই বা নিরেট বৈষম্যের বিবিধ তর্ক দ্বারা অখণ্ড জীবশক্তিকে দৈহিকের অবস্থাভেদে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বুঝিয়া, প্রেম ভক্তি প্রীতি প্রভৃতির উদার দৃষ্টি ভেদভাবে পরিণত হয়? ইহার মুল কারণই ভ্রান্তির বিকার। এই অজ্ঞানতার অন্ধ-

কারেই মানব প্রকৃতির সাধুভাব থাকে না, বিকৃত হইয়া পড়ে। কূট যুক্তির তীব্র কশাঘাতে, সাধু অসাধু, জ্ঞানী মূর্খ, ধনী দরিদ্র ইত্যাদি পৃথক ভাবের আতিশয্য বশতঃ বিশুদ্ধ সাম্যতত্ত্বকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত করে। সাত্ত্বিক গুণকে রজোগুণাদির আচ্ছাদনে রাখিয়া শিষ্টতা, সরলতা, দীনতাদি সদ্‌গুণের দিকে আদবেই দৃষ্টি পড়ে না। শরীর বিশেষে শক্তির তারতম্য দেখিয়া ভ্রান্তির আবর্ত্তে ঘুরিতে হয়। উচ্চ সিংহাসনস্থিত রাজা বাহাদুরের সঙ্গে একটা কথা কহিলে আপনাকে ধন্য বোধ করা যায়, ঐ বৃক্ষতলবাসী শতগ্রন্থী ছিন্নবস্ত্রপরিহিত গরিব ভাইটীর দিকে কেহই বা তাকায়? কাশীবাসী জটাভস্মভূষিত যোগীর প্রতি অচলা ভক্তি, ঐ রুগ্ন ভগ্ন শরীর সরল বিশ্বাসী ভক্তটাকে অশ্রদ্ধা ভাব; এই সকল ভেদরোগের যাতনায় সাম্যতত্ত্ব কেনই বা স্থান পাইবে।

এখানে একটী কথা মনে হয়। ভাল জিজ্ঞাসা করি, এইরূপ সাম্য সম্বন্ধে, কি আপত্তি হইতে পারে না যে, একজন মহাজ্ঞানী শিরোমণি মহাশয়কে যেরূপ ভক্তি করিতে হইবে, তাঁহার সঙ্গের ঐ ছাঁকা মূর্খ তল্পীদারকেও কি সেইরূপ ভক্তি করা উচিত? এমন ব্যবস্থাবিরুদ্ধ সাম্যভাব-স্ফূর্ত্তি ইচ্ছা করা কি সম্ভব হইতে পারে? কাচ কাঞ্চন কি সমান দরে বিক্রয় হইয়া থাকে? অকূল তরঙ্গময় সাগরে, আর ক্ষুদ্র একটী পল্বলে কখন সাদৃশ্য হয়? আপনি একটুকু গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া বুঝুন। তাহা যদি না হয়, তবে দয়া দাক্ষিণ্যাদি মহদ্বৃত্তি সমূহ কোথায় দাঁড়ায়? ইহারা ত জ্ঞানী মূর্খ ধনী মানী বুঝে না। আহা! যে সকল সাধু বৃত্তির সংস্পর্শে মানুষ দেবভাবের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হয়,

কাচ কাঞ্চন ভেদ থাকে না, উদারভাবে ভেদভাবকে দলিত করে, সভ্য সমাজে তাহাদের ঈদৃশ দুর্গতি! ব্রহ্ম কি ঐ তলপী-বাহক ভাইটীকে ভাল বাসেন না, তাহাকে অন্ন জল বাতাস দিয়া রক্ষা করিতেছেন না? উহার প্রাণে পবিত্রতার প্রকাশ পায়, এজন্য তিনি কি ব্যস্ত নহেন? তাঁহার নাম যে দয়াময়। তাঁহারই দয়ার কণিকামাত্র স্পর্শ করিলে পাপী নিষ্পাপী হয়, মূর্খ জ্ঞানী হইতে পারে, অসাধু সাধুভাবে নৃত্য করিতে থাকে। ঐ পান্থ-পদ-দলিত তৃণ-খণ্ড কি অগ্নিস্পর্শে প্রজ্জ্বলিত হয় না? আতসী প্রস্তরাশ্রয়ে সূর্য্যোত্তাপে লঘুশক্তি সম্পন্ন কার্পাস কি অনায়াস-লব্ধ অগ্নিজ্যোতি ধারণ করে না? স্পর্শমণি স্পর্শে লৌহ যেমন মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া, স্বর্ণ-জ্যোতিঃ গ্রহণ করে,—এমন কি প্রাণীহন্তা ব্যাধও তেমনই পাপ তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া দেবতা হয়। মানাকাঙ্ক্ষী অদূরদর্শীরাই এই সাম্যতত্ত্বকে উপেক্ষা করতঃ তাহার সেবায় উদাসীনতা প্রদর্শন করেন। জগতে অধিকাংশ ব্যক্তিকেই সম্মান-প্রিয়তার কূট যুক্তিতে আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। বস্তুতঃই মান, প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্য আধিপত্যে প্রকৃত সুখী হওয়া অতি অসম্ভব। বাহ্যিক সুখ ও প্রতিপত্তি লাভের ইচ্ছা বড়ই দুঃখের কথা—বলুন ত? ঐ যে ইউরোপ বাসিনী মাতৃগণ, ভারতে আসিয়া কলিকাতা নগরীর রাজপথ ও নানা-স্থান হইতে রোগগ্রস্ত ভাই ভগিনীগণকে বুকে লইয়া যথোপযুক্ত সেবা করিতেছেন, একমাত্র ভিক্ষাই সহায়, তাহারই আশ্রয়ে শত শত নর নারীর প্রাণ রক্ষা করিতেছেন; শুনা যায় আরও ইংলণ্ডে তাদৃশী মহামতী মাতৃগণ, মদ্যপায়ী অসদাচারীদিগকে শিক্ষা ও সেবা দ্বারা দেবভাবে আনিতেছেন; জেনারেল বুথের

সাধুশীলা কন্যা, বহুকষ্টে দেশে দেশে ধর্ম্মভ্রষ্ট পরিবারের দ্বারে দ্বারে পাদচারে ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, ইহাঁদের স্বর্গীয়ভাব স্মরণ করিলে ভোগসুখ সম্মানগরিমা তুচ্ছ বলিয়া মনে হয় না? এই নিঃস্বার্থ ভালবাসায় কি সাম্যতত্ত্বের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্বীকার করিবেন না? তাঁহারা মিলনের জন্য এত কষ্ট ক্লেশ যন্ত্রণা কেন বহন করিতেছেন—উদ্দেশ্য কি? আমার মনে হয়, জীবতত্ত্বকে তাঁহারাই অভিন্নভাবে দেখিয়া থাকেন। এস্থলে কি বুঝিতে পারা যায় না যে, ঐ সকল মাতৃগণের নিকট উচ্চ সম্মানভোগী রাজা ও বিপুল শাস্ত্রদর্শী শিরোমণি মহাশয় ইহাঁরা লজ্জিত হইতেছেন।

আহা! প্রেম ও সেবাতত্ত্ব কি মধুর! ইহাদের অভ্যন্তরে এমন কি দেবতত্ত্ব গূঢ়ভাবে লুক্কায়িত আছে যে পাপীকেও উন্মাদ করিয়া তুলে—সেটি কি? উহার নাম সাম্যতত্ত্ব—উহা স্বভাবতঃই ফুটিয়া উঠে। যেমন একটী চণকের দ্বিখণ্ড আবরণের ভিতর দিয়া বৃক্ষের অবয়ব সূক্ষ্মরূপে সহসা বাহির হয়, তেমনই এক ব্রহ্ম সৎভাবে বিশ্বজনীন প্রেম ও অপ্রভেদ জীবসেবা উভয়ের মধ্য হইতেও সাম্যতত্ত্ব প্রকাশ পায়,—রোগী ভোগী মূর্খ পণ্ডিত মানে না। আমরা এই সাম্যতত্ত্বকে শরীরগত ভাবের অবস্থাভেদে, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট তত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, ফলতঃ ইহা নিতান্ত দুঃখের কথা।

ঐ দেখুন, প্রকৃত পরমহংসগণের স্বর্গীয়ভাব কেমন সুন্দর! তাঁহারা অভেদভাবে, ব্রাহ্মণ চণ্ডালের হস্তের অন্ন ভোজন করিয়া কেমন প্রেম করিতেছেন এবং সাম্যভাবে সকলকে মাতাইয়া দিতেছেন। ইহার টীকা এখানে কি করিব! জীবত্বের স্বতন্ত্রত্ব?

কেহ কেহ যে জাতিভেদ মানেন না, সকলকে সমভাবে দেখিতে চান, কিন্তু কার্য্যতঃ ইহার মর্ম্ম কি এই যে, অজ্ঞান দরিদ্র ব্যক্তি নীচ, পণ্ডিতগণ শ্রেষ্ঠ, একদল উচ্চশ্রেণীর লোক সমাজে থাকিবে। ব্যক্তি বিশেষে অধিকার ভেদে দোষ কি? * ইহা কি নিষ্কলঙ্ক সার্ব্বভৌমিক উদার ভাব? জগতের সমস্ত নর নারী ও কীটাদির ভিতরে একই আত্মা বিরাজ করিতেছে, এ সত্য কি স্বীকার করিবেন না?

এই ত গেল বিশ্বজনীন প্রেম ও অপ্রভেদ সেবা ভাব মধ্যে সাম্যতত্ত্ব! এক্ষন দেখা যাক্ মহা-ভাবের আর দুইটী তত্ত্ব,—স্বরূপ ও জীব। এই উভয় তত্ত্ব মধ্যে স্বরূপ তত্ত্বের যে কিছু আভাস পাওয়া যায়, অগ্রে সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু বলিব। ঈশ্বরের সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ প্রভৃতি যে কয়টি স্বরূপের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, উপাসক মণ্ডলীতে অনেককেই দেখা যায়, একটী স্বরূপের আরাধনায় ব্রহ্মকে পৃথক পৃথক ভাবে দর্শন করেন। কিন্তু উহার মধ্যেও যে দর্শনের সামঞ্জস্য আছে, বোধ হয়, অল্প উপাসকই তাহা স্বীকার করেন। সম্প্রদায় বিশেষে অধিকাংশ ব্যক্তিরই এরপর ঐটি, ঐটীর পর এইটী, ইহা লইয়াই মতভেদ শুনা যায়। বাদ্ধি বোলে একটুকু গোল পড়িলে আর উপাসনায় তৃপ্তি হইল না, প্রাণে প্রতিবাদের ঝোঁক ধরিল, পকেট বুকে তখনই পেনশীল দিয়া আপত্তি লিখিতে বসিলেন। এইরূপ ভজন-বিভ্রাটে কি কখন স্বরূপ দর্শন সম্ভব হয়? বলিতে পারি না যে উহাতে উচ্চ উপাসকগণের তৃপ্তি হইতে পারে। উপাসকের হৃদয় মধ্যে স্বরূপের

* এই ভাবেই ত গুরু পৌরহিত্যের প্রাদুর্ভাব প্রবল হইয়া মানবের স্বাধীনতাকে গ্রাস করিতেছে।

প্রকাশ প্রভুরই ইচ্ছা। তিনি যদি ঐ কয়টী স্বরূপে একেবারে বদ্ধ না হইয়া সুখস্বরূপ, শক্তিস্বরূপ, পুণ্যস্বরূপ প্রভৃতি আরও স্বরূপভাবে প্রকাশ পান, তাহাও ত তাঁহারই কৃপার কথা। আরও দেখুন, আপনার একমাত্র শান্তিতে সুখ, আমার কেবল বন্ধুটীর জ্ঞানেই সুখ, বলুন ত ; ইহার মীমাংসা প্রভু ভিন্ন আর প্রেমে সুখ, ঐ কে করিতে পারে ? সকলের সুখদাতা সুখস্বরূপ বিধাতাই উপাসকের মর্ম্মগত ইচ্ছা বুঝিয়া উহা পূর্ণ করেন। অনেকে স্বাধীন রুচিতে মন্ত্রবদ্ধ কয়টী স্বরূপকে আরাধনার সময় আবৃত্তি করিয়া থাকেন। উহাতে কি বাস্তবিক স্বরূপ তত্ত্বের প্রকাশ চূড়ান্ত হইয়া গেল ? আমার মনে হয়, তাহা ঠিক নহে। সত্যে প্রেম, প্রেমে শান্তি, শান্তিতে মঙ্গল, মঙ্গলেও একই পরমানন্দময় বিধাতার পূর্ণ স্বরূপ, ইহার ভিতরে এর পর তারপর বিবেচনা হয় না। এইভাবে বস্তুতঃই পূর্ণ প্রকাশকে মন্ত্রভাবে প্রচ্ছন্ন করা হয়। স্বরূপশক্তির উজ্জ্বল ভাব ম্লান হইয়া যায়, কেবল ভাবুকতার উচ্ছ্বাসবেগে প্রাণকে ব্যতিব্যস্ত করে, এজন্য উচ্চ উপাসকগণ সকল স্বরূপের মধ্যে এক পরমানন্দ প্রভুকেই দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন। নিজের ইচ্ছাতে প্রভুকে টানাটানি করিয়া ব্যস্ত করেন না।

এ সম্বন্ধে আর একটী কথা আছে। লোক শিক্ষার জন্য যদি কোন প্রকার নিয়ম বা প্রণালী না থাকে, তবে কি তাহাতে সাধনবিভ্রাট হয় না ? এ কথার উত্তর পূর্ব্বে অনেক বার উক্ত হইয়াছে। ঈশ্বর সপ্রকাশ, তিনি কোন মানবীয়, রুচিগত ক্রিয়া বা প্রণালীতে বদ্ধ নহেন। অগ্নি যেমন বহু বস্ত্রখণ্ডে আবৃত হইলেও আপনি ফুটিয়া উঠে, তেমনই ঈশ্বর-স্বরূপও

ক্রিয়া ও প্রণালীবদ্ধ ভাবকে ভেদ করিয়া স্বভাবতঃই প্রকাশ পান। বরং নিয়মাদিতে আটক রাখিলে প্রভুর প্রকাশ সম্বন্ধে বিঘ্নই ঘটে; কারণ, সত্যের অনিবার্য্য অনন্ত গতি কি একটী প্রণালীতে আবদ্ধ থাকে? একি সম্ভব? আমি বলি কখনই নয়। উপাসকগণ মধ্যে যিনি আপনার ইচ্ছা, রুচি, কামনাদি বিসর্জ্জন দিয়া প্রভুতে হৃদয়, মন, প্রাণ উৎসর্গ ও নির্ভর করিতে পারেন, তিনি প্রকৃত উপাসনা প্রার্থনা দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন বা লাভ করিতে বঞ্চিত হন না। অপূর্ণ মানব ত আপনার অভাব বুঝে না, প্রভুই সেটা বুঝাইয়া দেন। আমাদের অন্ন জলের আবশ্যক হইলে, ঈশ্বরই ক্ষুধা-তৃষ্ণা দ্বারা জানাইয়া দেন, প্রত্যেক উপাসকের মর্ম্মভেদী অবস্থা দেখিয়া আপনার ভাবে আপনি প্রকাশিত হন এবং সাধকের প্রাণের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। তবে আর এটার পর সেটা ভাবিবার প্রয়োজন কি? উপাসক, যদি পূর্ণ পরমানন্দময় পরব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ে, প্রভু যখন যে স্বরূপে প্রকাশ হন, তখন সেই স্বরূপই অনন্তময়, ভুমানন্দে পরিপূর্ণ।

এইত স্বরূপতত্ত্বের কথা। এখন জীবতত্ত্বের মহাভাবের কথা কিছু চিন্তা করা যাক্। "একমেবাদ্বিতীয়ং" একমাত্র ঈশ্বর আর দ্বিতীয় কিছু নাই, এ কথায় আপত্তি কি? জ্ঞানের সূক্ষ্ম সীমায় উপনীত হইলে অদ্বৈতবাদ ব্যতীত দ্বৈতবাদ থাকে না, এক অবিনাশী চৈতন্যই নিত্য। এই অখণ্ড চিন্ময় মহাশক্তির বিষয় চিন্তা করিলে বস্তুতঃ দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে সন্দেহের কথা বটে। জ্ঞানের তীক্ষ্ণ চিন্তার উত্তাপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব রক্ষাই কঠিন, তাহার উপরে আবার জীব-শক্তি ধরিয়া দ্বৈতাদ্বৈতভাব? তবে

এখন কি বুঝিব; যে জ্ঞানে নিরীশ্বরবাদকে উপস্থিত করে; ঐ জ্ঞানের ভিতরেই ত অনাবৃত তত্ত্বজ্ঞান আছে, তাহাতেই ত আবার ব্রহ্মের স্থিতিভাব বুঝাইয়া দিতেছে। ভাবিয়া দেখুন, শুষ্ক সোঽহং জ্ঞানটুকু ঘুচিয়া সরল বিশ্বাসে বুঝিলে ঐ জ্ঞানই-তত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্ম। ব্রহ্মই আবার জীবভাবে আপনাতে আপনি বিরাজ করিতেছেন। ব্রহ্ম কি দ্বৈতাদ্বৈতভাবে প্রকাশ হইতে পারেন না? একটী বীজের মধ্যে বৃক্ষ-পত্র ফুল-ফল এ সকল কি থাকে না, কোথা হইতে আইসে? সৎ চিৎ-আনন্দ হইয়া, ঐ সমস্ত স্বরূপ তত্ত্বের আস্বাদন ভোগ কে করে? আপনি আপনার ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যভাব দর্শন করিতেছেন। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ বলিতেছেন—

"আপন মাধুর্য্য হরে আপনার মন,
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন;"

তবেই দেখুন, পরমাত্মাই আত্মারভাবে প্রকাশিত হইয়া, দ্বৈতাদ্বৈতের মধুর লীলায় মগ্ন রহিয়াছেন। আমরা জগতের ভ্রান্তিভাবে মুগ্ধ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হই এবং নিত্যযুক্ত মহামিলন যোগের উজ্জ্বলভাবে ডুবিতে ইচ্ছা করি না। ভাবিয়াও দেখি না যে, নিরাকার চিচ্ছক্তির ভাবের বিকাশ জীবশক্তি ইহাও কেবল উপাধি মাত্র, এক অখণ্ড চিন্ময় পরমাত্মাই আবার জীবভাবে অভিহিত। মধু ও মিষ্টতা যেরূপ একত্র জড়িত; সেইরূপ এক ব্রহ্মই শক্তি ও ভাব উভয় ভাবে আপনার আস্বাদন আপনি ভোগ করিতেছেন। যখন এক মহাশক্তি ভিন্ন আর কিছু নাই, বিশেষতঃ নিরাকার তত্ত্ব অনন্ত ও নিত্য, তখন পরিমিত সাকার তত্ত্বে যে আমরা মানবীয় ভাবে স্বতন্ত্র বুঝিয়া

থাকি, তাহাই ভ্রান্তি। অসীম মহাশক্তির ভিতরে সীমাবদ্ধ স্থূলতত্ত্ব সকল ইহাও ব্রহ্মলীলার উপাদান বটে, কিন্তু বুঝিতে হয় যে, এক অনাদি শক্তি জড়ীয় অচেতন পদার্থ মধ্যে অবস্থিত সত্ত্বেও অস্পর্শ ও নির্লিপ্ত। * এই শক্তিটীই ব্রহ্মশক্তি। যোগীগণ, যখন সাম্য, স্বরূপ, জীব এই তিনটী তত্ত্বকে প্রাণে ধারণ করিয়া, তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি প্রত্যক্ষ করেন, তখনই মহামিলনের মর্ম্ম বুঝিয়া কৃতার্থ হন এবং মহাভাবের তত্ত্বও পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারেন।

এই অভ্রান্ত তত্ত্বজ্ঞানের ভাব, অনেকে জড় বিজ্ঞানাদির আপাতমধুর অদ্ভুত ব্যাপারে পড়িয়া জীবে ব্রহ্মে যে নিত্যযোগ ও অনন্ত ভাবে দ্বৈতাদ্বৈত লীলারস ভোগের মধুর রসাস্বাদন, বুঝিতে চান না। অসার যুক্তি তর্কের ঘোরতর তরঙ্গে পড়িয়া পরিমিত ভাবে পরিচালিত হইতেই দেখা যায়। এমন কি, উচ্চ সাধকগণের মধ্যেও ঐ ভাব পরিস্ফুট হইতে থাকে; তাঁহারা একটুকু উর্দ্ধে উঠিয়া উন্মাদিনী ভক্তির উত্তেজনায় রূপক কল্পনার ভাবকেই প্রাণে স্থান দেন। ব্রহ্মযোগে মহাভাব তত্ত্বের সার মর্ম্ম হৃদয়ে গ্রহণ করেন না, বাহ্যিক ভাবের ভিতরে টলিয়া পড়েন। সত্য কথা; সাধকগণ যে আধ্যাত্মিক ও রূপকাদি দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ গঠন করিয়া যোগ ও মহাভাব তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন, তাহা পরিণামে ঠিক থাকে না। জল-

* অনন্তে দ্বৈতলীলার বস্তুরূপে সুখ, শান্তি, পুণ্য, পবিত্রতা বিরাজ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন দুঃখ, যন্ত্রণা, পাপ, তাপ, ভ্রান্তি প্রভৃতি ইহারাও বিচরণ করিতেছে, কিন্তু ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে সক্ষম নহে। কেননা, ব্রহ্ম যে অস্পর্শ শক্তি-স্বরূপ "শুদ্ধ মপাপবিদ্ধম্"।

বিম্বের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী—অল্প সময়েই জড়ীয় ভাবে পরিণত হয়। এই জন্য ভক্তগণ মধ্যে অনেকেই স্থূলতত্ত্বের শক্তি ও ভাব পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া বাহ্যিক বৃন্দাবনে মজিয়া যান। সুতরাং তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াও স্থায়ী থাকে না। যাহাহউক, যোগী, ভক্ত, সাধক সকলের মধ্যেই ঐ রূপক আধ্যাত্মিকতাদি বদ্ধমূল রহিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়াও যে পরম সত্য দেখা যায়, ইহাও ত আনন্দেরই কথা। পরম ভক্ত রায় রামানন্দের সহিত মহাভক্ত চৈতন্যের মহাভাব তত্ত্বের যে কথা হয়, সকলেই জানেন। রূপক ভাবেও "সম্বিত শক্তির প্রকার ভেদে" জীবশক্তিকেই রাধিকা বলা হইয়াছে—

"সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের * স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ,
আনন্দাংশে আহ্লাদিনীসদংশে সন্ধিনী,
চিদাংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি।
কৃষ্ণের আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী;
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি।
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন,
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম,
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান।
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি,
সেই মহাভাব রূপ রাধা ঠাকুরাণী।" †

ইহাতে আধ্যাত্মিক ও রূপক ভাবেও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে এক চিচ্ছক্তিরই ভাবময় জীবের পূর্ণাঙ্গ প্রেমকেই রাধারূপে

* চিচ্ছক্তি। † জীবশক্তি।

গ্রহণ করা হইয়াছে। যাহা হউক, ভক্তগণ মধ্যেও নিরাকার পরব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈত ভাবের বিষয় জানা যায়। * পরবর্ত্তী সময়ের মানবগণ, যোগী ও ভক্তকে কাহারও বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে পর্ব্বত, কাহারও ষড়ভুজে বংশী, ধনুর্ব্বাণ, দণ্ডকমণ্ডলু দিয়া ব্রহ্মদর্শন করিতে ছাড়ে না। এই কারণে তত্ত্ব জ্ঞানের অভাব হইয়া যায়, মহামিলনে মহাভাব প্রকাশ পায় না।

তবে সেই মহাভাব তত্ত্ব কিরূপে বুঝিব। পৃথিবী সরল বিশ্বাস ও সহজ জ্ঞানের প্রতি নির্ভর করিতে চায় না, কূট তর্কের অনুসরণপ্রিয় পথিক বিচিত্রতার অনুযাত্রী হইয়া ব্রহ্মপ্রদত্ত স্বাভাবিক ভাবে কিছুতেই প্রবুদ্ধ হয় না—কেনই বা হইবে! জগতের আশু সুখপ্রদ মনমুগ্ধ ভাব কি কখন ভুলা যায়? স্বর্গের বিশুদ্ধ নিত্য সুখের ভাবে কেনই বা তৃপ্তি হইবে। সে সুখ যে সংসারে উল্‌টা বুঝায়। খ্রীষ্ট বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি ক্রুশ ব্যবস্থা হইল, সক্রিটিস বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাকে বিষ ভক্ষণ করিতে হইল; চৈতন্য বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি পড়িল; হাফেজ বুঝিয়াছিলেন, লোকে তাহাকে দেওয়ানা বা পাগল বলিত। হায়! এই অধম কি পাগলের যোগ্য! তবেই বুঝিতেছি পাগল না হইলে কেমন করিয়া বুঝিব।

---

* মহাভক্ত চৈতন্য উন্মাদিনী ভক্তির আবেশে মূর্ত্ত্যাদির পরিমিত দর্শনেও অধৈর্য্য হইতেন বটে কিন্তু শেষবার সমুদ্রে রেখা তরঙ্গের অভেদ ভাবে মহাভাবের আভা মাত্র দর্শন করিয়াই সমুদ্রে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। কেননা তিনি মত্ততা প্রমত্ত প্রেমে সহসা বিহ্বল হইতেন, এজন্য সংজ্ঞা থাকিত না। রেখা তরঙ্গ দর্শনের কথা গূঢ় হইলেও অসম্ভব নহে।

প্রাণটা মানে না সেই জন্য এমন গুরুতর বিষয়ের আলোচনাতেও প্রবৃত্ত হইয়াছি। জানিনা ইহার ভিতরে পিতার ইচ্ছা কি? আর কোন কথা নাই, তবে এইটুকু বলিতে ইচ্ছা হয়, ভগবত্তত্ত্বের বিষয় প্রকৃত উত্তর হউক বা নাই হউক, তাহার জন্য যদি প্রাণটা কান্দে, মন্দ কি? সকলের নিকট প্রাঞ্জলিপুটে বলিতেছি, পাগল বা দীন হইতে না পারিলে মহা মিলন মহাভাব তত্ত্ব, জানা যায় না। যতই দীন ভাবে আপনাকে আপনি দেখিবেন ততই স্বর্গের উচ্চ ভাব আসিয়া হৃদয়, মন, প্রাণকে আকৃষ্ট করিবে। তখন পশু, পক্ষী, কীটাদির শরীর ভাবে একই জীব শক্তির প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু বুঝিবেন না। চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ এবং বিচিত্র জগৎ সকল আর দৃষ্ট হয় না। একমাত্র পূর্ণ পরমানন্দময় ব্রহ্মাই দ্বৈতাদ্বৈত নিত্য লীলায় পিতা পুত্র বা সেব্য সেবক ভাবে ক্রীড়া করিতেছেন। জীবাত্মা, পরমাত্মার স্বরূপ শক্তিতে মগ্ন হইলেই মহাযোগ। পরমাত্মা জীবাত্মাতে প্রকাশ পাইলেই মহাভাব। ইহা ভিন্ন আর ত কিছু বুঝি না।

মোহ-মরীচিকা।

ঐ যে শ্মশানে সম্ভ্রান্ত বাবুটী চিতাগ্নিতে ভস্ম হইলেন, কোথায় বা তাঁহার অট্টালিকা, কোথায় বা অতুল ঐশ্বর্য্য, কোথায় বা স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, কিছুই ত সঙ্গে গেল না! বহু যত্নের শরীরটী দেখিতে দেখিতে পৃথিবীর ধূলির সহিত মিশিয়া গেল, একটু চিহ্নও রহিল না। কেবল ঐ সোণার ঘড়িটী, ঐ

বিলাতী পিক্‌চার খানি, ঐ ব্যাটাকে জব্দ করিতে হইবে, এই কথা বলিয়া চীৎকার করিলেন। রাম বিষ্ণু কিছুই ত বলিতে পারিলেন না। মনের আশা ভরসা সকলি বৃথা হইল। এই রূপ ভাবে ভাবিয়া দেখিলে কে জব্দ হইলেন? বিকারমগ্ন বাবুটী কি নহেন? ঐশ্বর্য্য গর্ব্বিত মানবের দেহপাতও কি ভয়ঙ্কর। হায়! যখন একটি সূচিকার সহিতও সম্পর্ক নাই, তখন ধনমত্ততার হুঙ্কার শব্দ কি ভ্রমের কথা নহে? ক্ষণ-ভঙ্গুর শরীরের গৌরব কি? যদি কালের শাসনকে অতিক্রম করিতে পারিতেন এবং ভীষণ ব্যাধি যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হইত, তাহা হইলে গর্ব্বিত হওয়া সম্ভব ছিল। ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মূর্খ, রাজা, প্রজা সকলেরই একই অবস্থা। শৃগাল কুকুরাদির শ্মশান-মহোৎসবে সকলেরই ত সমভাব। আহা! এস্থলে জগতের কেমন অপূর্ব্ব শ্রী ও সাম্যদৃষ্টি, পরস্পর কেহ কাহারও হইতে উচ্চ হইলেন না।

হে বন্ধুগণ! শ্মশান-ভূমির ভীষণ-দর্শনেও অসারকে সার ভাবিতেছেন! প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করিয়া আমিত্বের দাসত্বে বাধ্য হইতেছে! হায়! আমিত্ব কি ভয়ঙ্কর! কিছুতেই মানব প্রকৃতিকে উচ্চ আদর্শের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। ইহাতে আবার মায়ার বিবিধ প্রলোভন উপস্থিত। কিন্তু ইহা কি কর্ত্তব্য নহে যে, এই সকল বিঘ্ন বিড়ম্বনা সত্ত্বেও গন্তব্য পথের লক্ষ্য স্থির রাখিতে হইবে। মুহূর্ত্ত সময়েই যদি শ্মশান বৈরাগ্যকে আসক্তির পদতলে নিক্ষিপ্ত করেন, তাহা হইলে কি হইল? অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায়, পবিত্র বৈরাগ্যকে অন্তরে জাগ্রত রাখিয়া, প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করিলেও,

সংসারে নিষ্কলঙ্ক বিশুদ্ধ সত্যের অনুষ্ঠানে অনায়াসেই শান্তিলাভ হইতে পারে।

তাহা না হইয়া, ঐ দেখুন, বিষয়াসক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটী নীতির বহির্ভূত কার্য্যেই পরিতৃপ্ত। রাজনীতির ভিতরেও ঈশ্বরেরই বিধান উজ্জলরূপে জ্বলিতেছে, তাহা তিনি মোহমত্ততাবশে দেখিতে পান না, নিয়ত, ধূর্ত্ততা বুদ্ধির তীক্ষ্ণ ধারে জগৎকে খণ্ড খণ্ড করিতে ব্যস্ত। তিলার্দ্ধ কাল সময় নাই যে, দুই একটী ধর্ম্ম কথা বলেন। অধিক কি বলিব, জৃম্ভণ ছাড়িবার কালেও ঈশ্বরের নাম লন না। জীবনে বৈভব ভোগই একমাত্র সুখের নিদান। আবার পৃথিবী ছাড়িতে হইবে কি? তাঁহার নিকট কালেরই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাঁহার ইহাই বিশ্বাস। হায়! ধনস্পৃহার কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি! ঐ যে রোগ শয্যায় উপযুক্ত ধার্ম্মিক পুত্রটি ছট্‌ফট্ করিতেছেন, এখানে দেওয়ানখানায় একটি ফেরেবী মোকদ্দমার মন্ত্রণা চলিতেছে, নিঃসহায় ধর্ম্ম পরায়ণ এক ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করিবেন; কেননা সেই ব্যক্তি অধীনস্থ প্রজাগণকে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও জ্ঞানশিক্ষা দিয়া থাকেন।

বন্ধুগণ! ইতি পূর্ব্বে ঐ সম্ভ্রান্ত বাবুটীর শ্মশানের অবস্থা মনে পড়ে কি? দেখিয়াছেন ত শুভ্রকেশ বৃদ্ধটির বৈরাগ্যের তরঙ্গ! শরীর ক্ষণভঙ্গুর জলবিম্ববৎ অস্থায়ী, ঘন ঘন হা ঈশ্বর, ধনৈশ্বর্য্য কিছুই নয়, ইত্যাদি বলিয়া, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। আবার গৃহে আসিয়া, অল্প দিন মধ্যেই, "কত আর সুখে মুখ দেখিবে" দর্পণে সঙ্গীতটীর ঠিক অবস্থায় পহুঁছিয়াও, বহু মূল্যের একখানি দর্পণ খরিদ করা হইল। তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য বুঝি শ্মশানভস্ম মাখিয়া শ্মশানেই থাকিলেন! আর

সুখের সংসার ছাড়িবেন না, বাই খেম্‌টানাচ তামাসার খুব পড়িয়া গেল। এদিকে ভারতে, স্থানে স্থানে, ভীষণ দুর্ভিক্ষে শত শত নর-নারী মরিয়া যায়, আরও যাইবে, জানিয়াও কঠিন চক্ষে, এক বিন্দু জলও পড়িল না, পড়িবে কি? মুখ বাঁকাইয়া "হুঁঃ-ঘোড়দৌড় কবে হে?" এই বলিয়া গ্রাবু খেলিতে লাগিলেন। কখনও বৈষ্ণব ভিক্ষুক-দল আসিয়া ধর্ম্ম-সঙ্গীত গান করিলে বস্তবিকই তাহাতে বড় বিরক্ত হইলেন—হাই ছাড়িতে ছাড়িতে তাকিয়ায় ঠেস দিয়া নাক ডাকাইলেন। কিছুদিন পর বাবুটী হঠাৎ একটী ফৌজদারী মোকদ্দমায় পড়িলেন। তাহাতে এত যে ধনৈশ্বর্য্য ও বাবুগিরী সমস্ত শেষ হইল। দালানের ছাদ সকল অল্প দিনেই, ধুপ্ ধাপ্ পড়িতে লাগিল। ভগ্নগৃহে খেজুরের চাটাইয়ের আবরণ দ্বারা বাস করা ঘটিল। বড় বড় ঘর অশ্বথ প্রভৃতি বৃক্ষাদিতে আবৃত হইল। বাড়ীটী যেন লজ্জায় অরণ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে। হাতী, ঘোড়া, দাস, দাসী সকল কোথায়? বাবু ভাবিতে ভাবিতে শীর্ণ জর্ণ রুগ্ন ভগ্ন-শরীর, কঙ্কালাবশিষ্ট মাত্র আর নিমতলার ঘাট এড়াইতে পারিলেন না। ইনি কেমন ব্যক্তি?

আর এক শ্রেণীর মানবের অবস্থা দেখুন। ইনি জগতের কাহারো সহিত মিশেন না। কি জানি পরিচিত হইলে ভবিষ্যতে যদি এক ছিলুম তামাক ব্যয় করিতে হয়! মধুমক্ষিকার ন্যায় অর্থসঞ্চয়ই ইহাঁর কার্য্য,ইহার ভগ্‌বৎচিন্তা করিবার অবসর নাই,সুতরাং তাহা ঘটিয়া উঠিত না। কোন স্থানে নিমন্ত্রণ সাধন পাইলেই পূর্ণ মাত্রায় ভোজন চলিত। গূঢ় অভিপ্রায় জন্য বাহ্যিক-ভাবে একাদশী রবিবার, সোমবার, প্রায়ই করেন। কেন না

তাহাতেও কিছু সঞ্চয় হয়। ধন কোষ একটী পিত্তলের ঘটী। বহুদিন,বড় কষ্টে তাহাতে ৯৯৲টি টাকা জমা হইল কিন্তু তাহাতে আর একটী বিপদ ঘটীল, তাহার ধাক্কাতে, ছেলে মেয়ে- গুলির ছু'বেলা প্রায় আহার হইত না। নিজের ত অনেক দিন পূর্ব্বেই গিয়াছে। বাড়ীর কর্ত্রীর প্রতি বড় কড়াকড়ি হুকুম,এক সপ্তাহের পর একবারে দুইটী পয়সার অধিক গুড় লইতে পারিবে না। কাহার সাধ্য সে আদেশ লঙ্ঘন করে। অবশ্যই সকলে জানেন, ঐরূপ ব্যক্তির সঞ্চিত ধনে চোরের অধিকার আছে। এক শত পূর্ণ হইতে না হইতেই, ঘটিটী চুরি গেল। সঞ্চয়ীর অর্থ-শোকে অস্থিমাত্র সার হইল। ভয়ানক উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। কিছু দিন পরে 'নিরানব্বয়ের ধাক্কাতেই' মানব লীলা সম্বরণ করিলেন। হায়! এই ভাইটীর অবস্থা দেখিয়া কি প্রাণ কাঁদে না? শরীর ছাড়িবার সময় কেবল মাত্র ঘটি কৈ?—ঘটি কৈ?—আমার ঘটি কে চুরি করিল, এই বলিয়া নিঃশব্দ ও স্পন্দহীন হইলেন। কাহারও সহিত প্রাণের কথা কিছু বলিতে পারিলেন না, ঘোর অশান্তির অগ্নিতে হৃদয় মনঃ প্রাণকে দগ্ধ করিলেন। আহা! কি শোচনীয় ভাব।

সুহৃদ্গণ! একবার এ দিকে আসুন ত? ঐ যে দেখি- তেছেন নীল প্রস্তরমণ্ডিত প্রকাণ্ড প্রাসাদ মধ্যে এক্ষণে চর্ম্মচটিকা ও হিংস্র প্রাণী সকল বাস করিতেছে, অবশ্য শুনিয়া থাকিবেন, ঐটী গৌরপতি হোসেন সাহা বাদসাহের বিচারগৃহ। ও স্থানটী অতি বিস্তৃত, ইহার তিন দিকে স্রোতস্বিনী সকল আলবালরূপে সুশোভিত, অসংখ্য জনপূর্ণ ও মহা সমৃদ্ধিশালী ছিল, এক্ষণে স্থানে স্থানে ভগ্নাবশিষ্ট চিহ্নমাত্র দেখা

যায়। হা! ঐ স্থলে, প্রচুর ঐশ্বর্য্য ভূগর্ভে নিহিত থাকা সত্ত্বেও অরণ্যময়। যাঁহার প্রতাপে উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশ সকল কাঁপিত, তাঁহাকেও ঘোর দুর্গতিভোগ করিতে হয়। দিল্লীসম্রাটের অসংখ্য সৈন্য কিল্লার চতুর্দ্দিক অবরুদ্ধ করিল। গৌরেশ্বর বাহির হইবার পথ না পাইয়া, বহুদিন আবদ্ধ ভাবেই কাটাইলেন, দিল্লীসম্রাটের সৈন্যগণ অনেকদিন ছাউনী করিয়াছিল। এ স্থলে আরও একটী অপূর্ব্ব চিত্র দেখুন! ঐ মহা তেজস্বী গৌড়সম্রাটের মন্ত্রীকার্য্যে (উজির) রূপ-সনাতন নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা ভাবী বিপদাশঙ্কা হইতে উত্তীর্ণ হইবেন বলিয়া, মহাভক্ত চৈতন্যের উপদেশে উন্মত্ত হন, এবং কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ ক্রমে উভয়েই, পবিত্র ক্ষেত্র বৃন্দাবনে বাস করেন ও ভগবদ্‌নাম ধ্যান যোগে সমাধি প্রাপ্ত হন, কিন্তু বাদসাহের কোন বস্তুরই অভাব ছিল না। তথাপি সৈন্যসামন্ত থাকা সত্ত্বেও, বিনাযুদ্ধে সপরিবারে অনাহারে প্রাণ হারাইলেন। দিল্লী সম্রাটই বা কোথায়?—কি ভয়ানক অবস্থা।

বন্ধু সকল! ওদিকে আবার কাহাকে দেখিতেছেন? চিনিতে পারেন না? উনি যে ভট্টাচার্য্য উপাধিধারী মানবগুরু। পশ্চাতে যে সরল প্রকৃতি, সৌম্যমূর্ত্তি, সাধু ব্যক্তিটিকে দেখিতেছেন, উনি একজন সমৃদ্ধিশালী শূদ্র। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রধান শিষ্য। গুরু ঠাকুর, বহু যত্ন কৌশলে, শিষ্যটিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া তাঁহার ভূসম্পত্তি ও অস্থাবর যাহা কিছু ছিল, এমন কি, স্ত্রীধনটী পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করেন। এক্ষণে দলিল খানা মজবুদজন্য ঐ রূপ ব্যস্ত ভাবে যাইতেছেন। অবশ্য ঐ রূপ সত্যব্রত শিষ্যকে তত বিশ্বাস কিরূপে

করা যায়। সুতরাং একটী মুন্সী লোকের দ্বারা লেখাপড়া করা কর্ত্তব্য, এই জন্য অত ত্রস্ত ভাবে যাইতেছেন। দেখুন ত ঐ গুরুই ধার্ম্মিক না ঐ শূদ্র? দেবভাবের আবির্ভাব কাহার ভিতরে দেখিতে পান? ভক্তির পথে যাইতে হইলে ঐ শূদ্রটীর পদধূলি গ্রহণ করা কি উচিত হয় না? শাস্ত্রে আছে "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ" ইত্যাদি। তবে ঠাকুর মহাশয় এরূপ ধূর্ত্ততা বুদ্ধির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? যিনি তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দ্বারা আসাধুকে সাধু, মূর্খকে জ্ঞানী, অসরলকে সরল করিবেন এবং কুপথগামীকে সুপথে আনিবেন, তাঁহার কি এই কার্য্য? আবার ক্ষীর-সর-নবনীত প্রভৃতি উপাদেয় ভোজনে তৃপ্তি পায় না, স্বর্ণ পর্য্যঙ্কে * শয়ন না করিলে নিদ্রা হয় না, বামাকর শোভিত বৃন্ত ব্যজন ভিন্ন প্রাণটা উড়্ উড়্ করে, অম্বলবোলায় মৃগকস্তুরী মিশ্রিত থাম্বিরা তামাক টানিতে না পারিলে বড়ই কষ্ট হয়। ইহাকে কি হোসেন সাহা বাদসাহ হইতে কম বলিতে পারা যায়? হায়! শিষ্যের কাণের ভিতরে ক্লীং বা ক্লাং মন্ত্র দিয়াছেন অনেক দিনের কথা সে ভুলিতেও পারে, ঐ সত্বে সত্ববান হইয়া এতই রাজত্ব ভোগ। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এত ঐশ্বর্য্যসত্বেও একটী বড় গুণছিল। গুরুগিরী ব্যবসায়টী রক্ষার জন্য শিষ্যের বাড়ীতে কখন কখন গঙ্গাজল বিল্বদলাদি স্পর্শ করিতেন। স্ফূর্ত্তি কত! এক রাত্রে ১২০খানা কালী প্রতিমা পূজা করিতে পারিতেন। স্বয়ং প্রভু তাঁর আবার ভক্তি আরাধনার প্রয়োজন কি? এটি ভুল।

---

* অনেক অন্ধবিশ্বাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা বৃষোৎসর্গের ক্রিয়ায় স্বর্ণ রৌপ্যের ও সুখাসন দেন।

দেহী মাত্রেই কালের অধীন। সত্যসত্যই গুরুঠাকুর উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। আর সে আলবোলা নাই বিলাসিতা নাই, ক্ষণ কালের জন্যও প্রাণে শান্তি নাই। বিকারে অসম্বদ্ধ প্রলাপ ব্যতীত আর কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। অসহ্য দুর্গন্ধে বন্ধু বান্ধব কেহ কাছে আইসেন না, এমন কি প্রাণাধিকা প্রণয়িনী তিনিও পরিত্যাগ করিলেন। বাঁচিয়া থাকিতেই উপযুক্ত সন্তানেরা অতুল ঐশ্বর্য্য রাশি "ভূতে পশুন্তি বর্ব্বরা" এই মন্ত্রে শেষ করিলেন। ভিক্ষাই জীবন রক্ষার উপায় হইল। কিছু দিন পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় হা-টাকা, হা-টাকা, হা জল, হা জল বলিয়া শরীর ত্যাগ করিলেন। কি শোচনীয় ভাব!

এই ভাবে দেখিয়া আসুন। সংসারে উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর মধ্যেই অধিকাংশ ব্যক্তিই ঐশ্বর্য্য মত্ততায় সত্যকে একবারে তাড়াইবার চেষ্টা করেন। এমন প্রকৃতির লোক আছেন, যাঁহারা ভ্রূ ঊর্দ্ধে টানিয়া স্পষ্টই বলেন, অসত্য না বলিলে কি সংসার চলে। সত্য কথায় ব্যবসায়-বাণিজ্য বা কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

আচ্ছা মনে করুন; নিজের একটী সুবিধার কার্য্য জন্য পাঁচটী টাকা কাছে আছে; এখন পাঁচ বৎসর হইল একটী বন্ধুর নিকট পাঁচটী টাকা ধার করা যায়, তিনি ঐ সময়ে আসিয়া চাহিলেন। টাকা নাই ভাই; এ কথায় কি অন্যায় বলা হইল? যদি সত্য বলা হইত, তাহা হইলে কখনই ঐ সুবিধা দরের জিনিসটীতে আশাতিরিক্ত লাভ করা যাইত না। শাস্ত্রেও আছে, কার্য্য বিশেষে মিথ্যা বলিলে অপরাধ নাই।

এইরূপ প্রশ্নের উত্তর ঐ দেখ—সার্জ্জন লরেন্স নামা জাহাজে প্রায় আটশত নরনারী একত্রে যাইতেছিলেন। সমুদ্রে হঠাৎ ঝটিকা ভয়ানক প্রবল হয়। অর্ণবতরী বারিধির উত্তাল তরঙ্গে আন্দোলিত হওয়াতে, আরোহীদিগের কেমন শোচনীয় অবস্থা! যখন একজন বীরপুরুষ নির্ভীকান্তকরণে "আর জাহাজ রক্ষা হইল না, সকলে প্রস্তুত হও" এই কথা বলিলেন; তখন কয়টী লোক জগতের মনমুগ্ধকারী সুখের আশা পরিত্যাগ করতঃ ঈশ্বরে হৃদয়, মন, প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হন? অধিকাংশ ব্যক্তিই ঐ আমার ছেলেটী, ঐ যে ঘরের কোণে মাটীর তলে ঘটিটী থাকিল, আর দেখিলাম না, ইত্যাদি ভীষণ আর্ত্তনাদই করিতে থাকিলেন; দেখিতে দেখিতে জাহাজ অতল সমুদ্রগর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল। এই ত পৃথিবীর সুখের পরিণতি, হা! তাঁহাদের পুত্র কন্যা ধনৈশ্বর্য্য কোথায় রহিল! তাই বলি সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতির সম্মুখে অসত্যে তৃপ্তি লাভ কখনই সম্ভব নহে। আসক্তিপূর্ণ হৃদযেই উহা স্থান পায়। বাস্তবিকই ঐরূপ অসার ভাবনায় যিনি উন্মত্ত হন, তিনিই অসুখী! তাঁহাকে "শেষের সে দিন কি ভয়ঙ্কর" এই কথাটী চিন্তা করা উচিত। এই পৃথিবী অবশ্যই ছাড়িতে হইবে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

হে তত্ত্বজ্ঞানিগণ! আপ্রমিকেরা আশু সুখের জন্য অসত্যকে সত্য জ্ঞান করেন। অসার ধন সম্পদ, পুত্র কন্যা পরিজন যে ভ্রমের বস্তু অস্থায়ী, তাহা কেহই চিন্তা করেন না। বৃদ্ধ পিতা মাতার হৃদয়রত্ন উপযুক্ত সন্তান চলিয়া যাইতেছে। কাহার জন্যই বা পাপ প্রবৃত্তির প্রশ্রয়ে অশান্তি ভোগ, কাহার জন্যই বা

ঈশ্বরকে ভুলিয়া সংসারে দাসত্ব, কাহার জন্যই বা ছল-বল কৌশল দ্বারা নরক ভোগ করা, এ কি দুঃখের কথা নহে? ঐ-যে ভাইজী সর্পদংশনে বামপদ আর তুলিতে পারিলেন না। চক্ষের গতি শক্তি নিস্পন্দ, শ্বাস প্রশ্বাস একবারে বন্ধ, ক্ষণমধ্যেই অচেতন ও জড়বৎ,শত শত খড়্গাঘাতেও সংজ্ঞা নাই, মহানিদ্রায় অভিভূত। আর আমিত্বের কুহকজালে নিবদ্ধ থাকা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য? বলুন ত,মুখ আমি,না হাত, আমি? এস্থলে অন্নদাতা কর্ত্তা আমি বলা, কি উন্মত্তের কথা নহে? কিছু নয়—কিছু নয়—সকলই সেই অনন্ত ভূমা মহাপ্রভুর পুত্র কন্যা। সকল পদার্থই তাঁহারই। জগতের বিচিত্রতা দর্শন কেবল মাত্র দৈহিকভাব সম্ভূত। ইহা সমুদ্রবিম্বের লীলা মাত্র।

সংসারের বিচিত্র ভাব ধরিয়া অনেকগুলি কথা বলিলাম বটে, কিন্তু আমার কি দশা হইবে? আমি যে মহাপাপী! "হে প্রভো! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক", এই বলিয়া নিঃশেষ দিনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব? তাই বলিতেছি, নানাস্থানীয় তৃণ সকল একত্র হইলে, রজ্জুরূপে মহাবল ধারণ করে। সেইরূপ সকল ভাই ভগিনীরও সাধুসঙ্গ প্রার্থনীয়। তবে আমরা সক[illegible] প্রস্তুত করিতে সচেষ্ট হই। উপযুক্ত শূদ্র মহাত্মার ন্যা[illegible] দেবভাব না আসিলে কখনই পরিত্রাণ নাই। সে[illegible] বলিতেছি, সময় থাকিতে প্রস্তুত হওয়া একান্ত প্রার্থনী[illegible] সংসারে মোহমরীচিকায় পড়িয়া সময় পাত করা উচি[illegible]